পরমার্থ পত্রাবলী

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়ানুক্রমণিকা

পত্র সংখ্যা		পৃষ্ঠা

[এই পত্রাবলীর কিছু নির্বাচিত বিষয় ৮৯ পাতায় দেওয়া হল]

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

উদ্ধার কী করে হওয়া যায় ?

[১]

কী প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে ? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বড়ই অপরাধ। ধন যৌবন (সবই) অস্থির। কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেম এবং ভক্তিই চিরস্থায়ী। ইহাই লাভ করা উচিত। মন অতিশয় চঞ্চল। এটিকে অনবরত ভগবৎ-চরণে নিয়োজিত রাখলে এটির চঞ্চলতা দূর হয়। এই অসার সংসারে কেবলমাত্র রাম-নামই সারবস্তু। পুরানো ধ্বংসাবশেষ ও শ্মশানভূমি প্রত্যক্ষ করলেই সংসারের অসারতা প্রতীত হয়। সমুদ্রের জলে যেমন নুন, কাঠে যেমন আগুন এবং দুধের মধ্যে যেমন ঘি ওতপ্রোতভাবে থাকে, তেমনই পরমাত্মা সবকিছুতে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। নিত্য সেই পরমাত্মার ধ্যানেই কল্যাণ প্রাপ্তি সম্ভব। আপনি সেই 'প্রভু'কে ভুলে আছেন কেন ? স্ত্রী-পুত্র, অর্থ-ধন কী কাজে আসবে ? প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার কালে এসব কোনো কাজে আসে না। শরীরও আপনার সঙ্গে যাবে না। যা কিছু করা হয়, ফলরূপে তাই সঙ্গে যাবে। সেই প্রভুর সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলো না কেন ? তাঁর মতো প্রভু এবং প্রেমিক আর কোথায় পাবে ? এমন হিতৈষী বন্ধু আর কে আছে ?

উমা রাম সম হিতু জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু কোও নাহীঁ॥

—তুলসীদাস রামায়ণে মহাদেব উমাকে (পার্বতী) বলছেন, 'হে

উমা ! রামের মতো সুহৃদ এ জগতে আর কে আছে ? গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু—কেউই রামের সমতুল্য নয়।

এ দুনিয়ায় সবাই স্বার্থের জন্য তোষামোদ করে। তাহলে তুমি সেই 'প্রভুর' সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হও না কেন ? প্রভু তো তোমার কাছে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কেবল তাঁকে নিত্য স্মরণে রাখা উচিত। তাঁর নাম-জপ আর ধ্যানই সার। আর অবিরাম 'জপ' হলে ধ্যান আপনাআপনিই হবে।

তোমার এইসব বস্তু কী কাজে আসবে ? একদিন সবাইকে পঞ্চভূতে বিলীন হতে হবে। তাই যা সার বস্তু, তা শীঘ্রই অর্জন করে নিতে হবে। অমূল্য সময় নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। বাকিটা তোমার মর্জি নির্ভর।

[২]

নিজের স্বার্থের জন্য কারো সেবা নিতে নেই—স্বার্থই পাপের মূল। নিজধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। টাকা-পয়সা তো তুচ্ছ বস্তু, নিজের সর্বস্ব নাশ হয়ে গেলেও একমাত্র প্রভুকে ভরসা করে অন্য সব আশ্রয় ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই হবে। তাহলে চিন্তা কীসের ? তাঁকে প্রাপ্তির ব্যাকুলতায় যদি সর্বস্ব চলে যায়, তাও ভালো।

'নারায়ণ' হোবে ভলে, যো কছুঁ হোবনহার।
হরিসোঁ প্রীতি লগায়কে, ফির কহা সোচ বিচার॥
লগন লগন সবহী কহে, লগন কহাবৈ সোয়।
'নারায়ণ' জা লগনমেঁ, তন মন দিজৈ খোয়॥

নারায়ণ স্বামী বলছেন—'আমার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পরে আমার আর চিন্তা কীসের ? ঈশ্বরে 'ডুব' দেওয়ার কথা সবাই বলে, কিন্তু যখন নিজ শরীর-মনের বোধজ্ঞান পর্যন্ত লুপ্ত হবে, সেই হবে আসল 'ডুব' দেওয়া। সেই হল প্রকৃত 'তন্ময়তা'।

প্রভুর ইচ্ছায় যদি আমাদের নরক ভোগও করতে হয় তাহলে তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভোগ করা উচিত। জগতে তাঁর অজান্তে কিছুই ঘটছে না।

যখন সবকিছুই তাঁর জ্ঞাত, তাহলে অযথা চিন্তান্বিত হয়ে, তাঁর অনাশ্রিত হওয়ার দোষে দোষী হব কেন ? তিনি সর্বত্রই স্বয়ং সগুণে অথবা গুণাতীত রূপে বর্তমান রয়েছেন, তাহলে তোমার চিন্তার কারণ কী ? প্রভুর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ করা উচিত। যা কিছু ঘটছে শুধু দেখে যাও। প্রভু যা কিছু করেন তাতেই আমাদের আনন্দিত থাকা উচিত। তাঁর বিধানে অসন্তুষ্ট হয়ে মন খারাপ করলে তিনি কী করে সন্তুষ্ট হবেন ? শুধু তাঁর নাম জপ করে যাও। 'ধ্যান' আপনাআপনিই হবে।

খুবই সংক্ষেপে এখানে 'প্রেম' ও 'শরণাগতি' সম্পর্কে আলোচনা করা হল। মন যখনই খারাপ হবে, এই লেখা পাঠ করা উচিত।

[৩]

তুমি ভগবানে 'প্রেম' (ভালোবাসা বৃদ্ধির) হবার উপায় জানতে চেয়েছ। সে ভালো কথা। ভালোবাসা বৃদ্ধির অনেক উপায় আছে, যার মধ্যে নীচে কিছু লেখা হল—

(১) ভগবৎভক্ত দ্বারা বর্ণিত ঈশ্বরের গুণকীর্তন এবং তাঁর প্রেম ও প্রভাবের কথা শুনলে অতি শীঘ্র ভগবানে প্রেম জাগে। ভক্ত সান্নিধ্যের অভাবে শাস্ত্রচর্চাতেও সৎসঙ্গের সমান কাজ হয়।

(২) নিষ্কামভাবে ও মনোযোগ সহকারে অনবরত পরমাত্মার নামজপের অভ্যাসের ফলেও ঈশ্বরে প্রেম বৃদ্ধি সম্ভব।

(৩) পরমাত্মার সঙ্গে তীব্র মিলনেচ্ছাতেও 'প্রেম' বৃদ্ধি হতে পারে।

(৪) ভগবান নির্দেশিত আচরণ দ্বারা তাঁর মনের মতো করে চললেও ভগবৎপ্রেম বৃদ্ধি হতে পারে। শাস্ত্রে কথিত নির্দেশই ঈশ্বরের নির্দেশ বলে জানবে।

(৫) ঈশ্বরপ্রেমী ভক্তের মুখনিঃসৃত এবং শাস্ত্রবর্ণিত ভগবানের গুণকথা, প্রভাব ও প্রেমকথা নিঃস্বার্থভাবে জনগণের মধ্যে বর্ণনা করলেও ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে পারে।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের সাধনের মধ্যে যদি একটিরও যথাযথভাবে পালন করা হয় তাহলে ভগবানে প্রেম জাগতে পারে। মান-অপমানকে

সমতুল্য জ্ঞান করে, কোনো কামনা-বাসনা না রেখে সকলকে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানে সেবা করা উচিত। এরূপে স্বতই ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জন্মানো সম্ভব। সকলের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি হলে কারও প্রতি ক্রোধ হওয়া সম্ভব নয়। যদি ক্রোধ হয় তাহলে বুঝতে হবে এখনও ভগবৎ-ভাব হয়নি। কখনো উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। যাহাই ঘটুক না কেন—সবেতেই চিত্তে প্রসন্নতা থাকা উচিত, কেননা সবই প্রভুর ইচ্ছানুসারে এবং তাঁর নির্দেশে সম্পাদিত হয়। প্রভুর সম্মতিতে আমাদের সম্মত থাকা উচিত। সেই প্রভুর ইচ্ছার প্রতিকূল এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়—এভাবে দৃঢ় নিশ্চয় করে প্রভুর প্রসন্নতায় প্রসন্ন থেকে সবসময়ে আনন্দে মগ্ন থাকা উচিত।

[৪]

সাধন-ভজন আগের থেকে কিছুটা ভালো হচ্ছে জানা গেল। সে বড় আনন্দের কথা। চিঠিতে আমার প্রশংসা করেছো। কিন্তু এরূপ লেখা ঠিক নয়। একমাত্র ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনি থাকতে অন্য কারো প্রশংসা করা ঠিক নয়। তুমি জানতে চেয়েছ ঈশ্বরের ধ্যান ও ভজনার জন্য কী প্রকার সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং পরমাত্মাকে সর্বদা স্মরণে রেখে, নিষ্কামভাবে কর্তব্য বোধে কীভাবে জীবন নির্বাহ কর্ম করা যায় ? সে খুব ভালো কথা। তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হলে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হতে পারে। তবুও সাধারণভাবে নীচে কিছু উপায় লেখা হল :

(১) কোনো বস্তুর (দ্রব্যের) দরদাম নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার পরে ওই দ্রব্য ওজনে অথবা পরিমাণে কম দেওয়া, বা বেশি নেওয়া অনুচিত।

(২) যে দ্রব্য ক্রেতাকে দেখাবে, সেই দ্রব্যই তাঁকে দেওয়া উচিত। ওর মধ্যে অন্য দ্রব্য কণামাত্রও মিশেল দেওয়া উচিত নয়।

(৩) লাভের অঙ্ক (পরিমাণ) একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে, (বিক্রীত) দ্রব্য কম দেওয়াও উচিত নয়, (দাম) বেশি নেওয়াও উচিত নয়।

(৪) নিজের হক্কের ধন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করা উচিত

নয়। ছল কপট অথবা জোরজবরদস্তি করে কিছু গ্রহণ করা উচিত নয় এবং হক্কের ধন ছাড়া কারো কাছে মিনতিপূর্বক অধিক যাঞ্চা করাও উচিত নয়।

(৫) নিষিদ্ধ বস্তুর কারবার করা অনুচিত। যাতে বিশেষ পাপ বা জীবহিংসা হয়, সেই বস্তুর (দ্রব্যের) ব্যবসা করা উচিত নয়।

(৬) যে কাজ করতে গেলে মন 'পাপ হবে' বলে সায় দেয়, সেই কাজ করা উচিত নয়।

পাপের ভয়, মৃত্যু ভয়, পরলোকে শাস্তির ভয় কিংবা ঈশ্বর লাভে বিলম্বের ভয় প্রভৃতি কারণেও পূর্বোক্ত পাপ কাজ থেকে বিরত হওয়া সম্ভব। কিন্তু লোভ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। ভগবানে ভালোবাসা জন্মালে, তার প্রভাবে কিছুটা চেতনা হলে, লোভ অতি দ্রুত দূর হতে পারে। এইজন্য সর্বাগ্রে সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত যাতে ঈশ্বরে প্রেম জন্মায়। এর উপায় ...... লেখা পত্রে উল্লিখিত হয়েছে।[১] উপরে বর্ণিত সৎ উপায়গুলো তো কেবল পাপকর্ম হতে বাঁচার জন্য লেখা হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু কথা আছে যা এই সবকিছুর চেয়ে অনেক বড়। সেগুলি নিম্নরূপ :

লোভত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র ধর্মের ভাবে ভাবিত হয়ে, 'ঈশ্বরই সব'—এই কথা জেনে এবং ঈশ্বরের আদেশ মনে করে জাগতিক ধর্ম পালন করলে সংসারের সমস্ত ব্যক্তিরই প্রভূত উপকার হবে।

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের চিন্তাটুকু রাখেন কিংবা তার জন্যও চিন্তা করেন না এবং যাঁদের লাভ-লোকসান, আনন্দ-শোক স্পর্শ করে না—এমন ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র লোকহিতার্থেই কাজ করেন অর্থের জন্য নয়, তাকেই বলে নিষ্কামভাব। এর দ্বারা বিশেষ চিত্তশুদ্ধি হয়।

স্বার্থরহিত হয়ে পরিবার অথবা সারা বিশ্বের মানুষের হিতার্থে যে আচরণ তাই-ই উত্তম আচরণ এবং এতে হৃদয় শুদ্ধ হয়। এর দ্বারা ভজন ও সৎসঙ্গের যথোচিত সাধনাও সম্ভব।

---

[১]প্রেম লাভ করার কিছু উপায় ৩নং পত্রে লেখা হয়েছে—ওইগুলি দেখা উচিত।

ধ্যানের অভ্যাসের দ্বারা ধ্যান হওয়াও সম্ভব। চেষ্টা করলে সবই হতে পারে। সৎসঙ্গ ও জপের অধিক অভ্যাস হলে পরে নিরন্তর ধ্যান হওয়াও সম্ভব। কর্মরত অবস্থায় প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ এবং মনে মনে ঈশ্বরীয় রূপের ধারণা করলেও একাকী থাকাকালীন যথেষ্ট লাভ হয়। যদি সৎসঙ্গের অভাব হয়, তাহলে ঈশ্বরে ভক্তি হয় এমন গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ইহাও সৎসঙ্গের নামান্তর।

[৫]

(এই পত্রে প্রশ্নোত্তর আছে, প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন লিখে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে—সম্পাদক)

প্রশ্ন—সমস্ত বিশ্বসংসারে 'জীব' সর্বদাই দুঃখ পাচ্ছে। কোনো দেশেই শান্তি নেই। দেশে দেশে, ঘরে ঘরে অশান্তি হচ্ছে। একে অপরের ক্ষতি সাধনে উদ্যত। এই পরিস্থিতি থেকে জীবের পরিত্রাণের উপায় কী ?

উত্তর—ঠিক কথা। পরিত্রাণ তো নিশ্চয় হওয়া চাই। তোমার অন্য প্রশ্নের উত্তরে এই সম্বন্ধিত উপায়ের কথা বলছি।

প্রশ্ন—বর্তমান পৃথিবী দুঃখ দাবানলে (নিরন্তর) দগ্ধ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে হয়তো শীঘ্রই ঘরে ঘরে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি হবে। মানুষের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খুবই ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে চলেছে। এর কারণ কী ?

উত্তর—এই কথা আংশিক সত্য এবং যুক্তিপূর্ণ। ঈশ্বর সম্বন্ধিত চর্চার অভাবই এর কারণ। জগতের প্রায় সকলেই শুধুমাত্র পার্থিব সুখকেই (কাম্য) শ্রেয় বলে মনে করে তার পিছনে ছুটছে। পৃথিবীর প্রায় সকলের দৃষ্টিই প্রায়শই সাংসারিক বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ লোকেই ভোগযোগ্য (ভোগ্য) বস্তুর সঞ্চয়কেই পরম কাম্য বলে মনে করে অথচ এটিই সকল অনর্থের মূল। অর্থের লোভে যেমন ব্যবহারের (আচরণের) পরিবর্তন হয়, ঠিক তেমনই বিষয় লালসায় মানুষ ধর্মাচরণ ভুলে যায়। যদি এই পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়, তাহলে এই বিবাদ অশান্তি আরও প্রবল হতে পারে, কারণ পার্থিব সুখের প্রবল আকাঙ্ক্ষা

মানুষকে পশুতে পরিণত করে। সকলেই ভোগ্যবস্তুর পিছনে দৌড়াচ্ছে এবং যেখানেই সেই বস্তু পাচ্ছে, অন্তর্কলহের সৃষ্টি করছে।

উদাহরণস্বরূপ কোনো কুকুরের মুখে এক টুকরো রুটি দেখলে বা কোনো পাখির মুখে মাংসের টুকরো থাকলে যেমন অন্যান্য কুকুর বা পাখি তার পিছনে লেগে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে কলহে (কামড়াকামড়ি করে) লিপ্ত হয়, জড়বাদকে আদর্শ মেনে নেওয়ার পরিণামও প্রায়শই এই প্রকারই হয়ে থাকে। এইজন্য এই সমস্ত বিলাসিতা, আরামভোগ-আয়াস প্রভৃতি সমস্ত ভোগ আসক্তিকেই অন্তর থেকে ত্যাগ করা উচিত। এরূপ হলেই সুখ সম্ভব।

প্রশ্ন—এইভাবে কতদিন জীব বদ্ধ হয়ে থাকবে ? অর্থাৎ কবে এর থেকে উদ্ধার পাবে ?

উত্তর—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যোগিপুরুষগণই কিছুটা জানতে পারেন। পুরুষার্থ অনিয়ত, পুরুষার্থের ফল কখন এবং কীভাবে পাওয়া যাবে একথা বলা সম্ভব নয়। এর উত্তর কেবল ভগবানই জানেন। এই বিষয়ে কোনো মানুষই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না।

কখন, কোন ব্যক্তি (সেই) পরমপদ অর্থাৎ ঈশ্বর-লাভ করবেন, যদি পূর্বেই একথা জানা হয়ে যায় তাহলে 'সাধনা'র প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ বলতে পারে যে উদ্ধারের সময় যখন পূর্ব-নিশ্চিত আছে তাহলে সাধনার প্রয়োজনীয়তা কী ? যদি বলা হয় যে 'স্বয়ং ঈশ্বরও একথা বলতে পারেন না'—তাহলে ঈশ্বর যে ত্রিকালজ্ঞ একথা অসত্য প্রমাণিত হয়। এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে 'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন'। এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের কিছু উপায় আছে। হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, এই হিন্দু জাতির দুর্দশা দূর করার জন্য নীচের চারটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) ধর্মশিক্ষার প্রচার।

(২) ত্যাগী, অনুভবী এবং বিদ্বান সজ্জন ব্যক্তিদ্বারা পবিত্র ধার্মিক ভাবের দেশজুড়ে প্রচার।

(৩) অল্প দামে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর প্রচার।

(৪) ধর্মরক্ষার জন্য অনাথ শিশুদের সাহায্যার্থে অনাথ-আশ্রমের স্থাপন।

এই পথে চললে এই জাতির মধ্যে নীতি, ত্যাগ, ভক্তি এবং ধর্মাচরণের বিকাশ ও প্রসার হওয়া সম্ভব এবং সম্ভবত এর প্রসারের দ্বারা এই জাতি দুঃখ দাবানলে দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে পারে।

বিশ্বের সমগ্র জাতির দৃষ্টিকোণ থেকে বললেও প্রায় একই ধরনের কথা বলা যেতে পারে। সমষ্টিগত উদ্ধারের জন্যও ত্যাগ, শিক্ষা, ভক্তি এবং সদাচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং এই কাজ কেবলমাত্র স্বার্থত্যাগী সেবাপরায়ণ সৎপুরুষের দ্বারা সম্ভব। 'নিষ্কাম সেবা' হল এর একমাত্র উপায় যার দ্বারা সংসারকে জয় করা যায়। যতদিন না এমন পরহিতব্রতী, স্বার্থত্যাগী পুরুষের দ্বারা জগতে উপর্যুক্ত ভাবের প্রচার হচ্ছে ততদিন জগতের দুঃখ-সকল বিনাশ হওয়া কঠিন। জগতে এমন পুরুষ খুব কম সংখ্যক আছেন এবং সেই কারণেই জগত দুঃখপূর্ণ। সম্ভব স্থলে এমন নিঃস্বার্থ পুরুষ তৈরি করা প্রয়োজন—আর সেই কাজ একমাত্র মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব। গীতার ১২ অধ্যায়ের ৩, ৪[১] এবং ১৩ অধ্যায়ের ১৪[২] শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী—সর্বদা সর্বভূত হিতে রত, সকলের প্রতি দ্বেষহীন, মৈত্রী করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বের যখন যে স্থানে (অংশে) নিজেকে জনহিতে নিযুক্ত রাখেন সেইসব স্থানে (অংশে) জীবসমূহের দুঃখ বহুলাংশে লাঘব হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—জীবের এই দশায় পরমাত্মার করুণা তো রয়েছেই কিন্তু এখন তো সেই করুণাসিন্ধুর সহ্য-সীমাও ভেঙে যাওয়া উচিত ?

উত্তর—উপরের প্রশ্নের মাধ্যমে সম্ভবত তুমি বলতে চেয়েছো যে

---

[১]যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে। সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্‌॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

[২]অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণঃ এব চ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢনিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

অবতার পুরুষ হয়ে অবতরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের এখন জীবকে উদ্ধার করা উচিত। করুণার বশে এ কথা বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন সময় এসেছে কী না এই কথা কেবলমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অনুমানে বলা যেতে পারে, সম্ভবত ঈশ্বরের স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ার সময় এখনও আসেনি। (সময়) এসে গেলে এতদিনে তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হতেন, জীবের এই দশার তো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তাই মনে হয় এখনও সেই সময় হয়নি। কলিযুগে যে ধরনের পরিস্থিতি হওয়া উচিত তার থেকে খারাপ পরিস্থিতি হলে ঈশ্বর 'অবতার' হতে পারেন। কিন্তু মনে হয় সেই পরিস্থিতি এখনও আসেনি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ আয়ু পূর্ণ হলেই মারা পড়ে। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নের সংস্থান আছে। জোর করে প্রাণ-হত্যা প্রায় হয়ই না। এই ধরনের সংকট পশুপক্ষীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং সেটা প্রায় অনাদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। তবে ভারতবর্ষে গোজাতি—বিশেষত সবল দুগ্ধবতী গাভীর বলপূর্বক অকালে হত্যার কথা বলা যেতে পারে। বর্তমান সাংসারিক পরিস্থিতি যে তোমার কাছে এত অসহনীয় হয়ে উঠেছে মনে হয় সেটি তোমার (মানসিক) দুর্বলতা অথবা করুণার প্রকাশ। কিন্তু যদি ক্রমাগত এই অবিচার চলতে থাকে তাহলে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়াও সম্ভব অথবা তাঁর আদেশ প্রাপ্ত (অধিকারপ্রাপ্ত) কোনো মহাপুরুষের আগমনও সম্ভব। অথবা ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত কোনো ভক্ত মহাত্মা তাঁর অধিকারী হয়েও তাঁর কাজ সামলাতে পারেন—সম্রাটের অনুপস্থিতিতে কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তি যেমন তাঁর কাজ সামলান ঠিক তেমনই।

প্রশ্ন—যদি জীবের সহজেই পরমাত্মার নিত্য কৃপা অনুভূত হয় তাহলে তো জীব সহজেই পরমাত্মার কৃপা লাভ করে কৃতার্থ হতে পারে ?

উত্তর—ঠিকই বলেছো, জীব যদি চায় তো এমনও ঘটতে পারে।

প্রশ্ন—না জানি মায়ার কী প্রবল শক্তি যে, ঈশ্বরের অসীম কৃপা পদে পদে প্রত্যক্ষ করেও এই মোহাবৃত জীব বারে বারে সে কথা (ঈশ্বরকে) ভুলে যায় ?

উত্তর—ঠিকই বলেছো। কিন্তু ভগবানের প্রবল শক্তির সামনে মায়ার শক্তি কিছুমাত্র নয়। যে ব্যক্তি মায়ায় বশীভূত, তার কাছে মায়ার শক্তি প্রবল মনে হয়। পরমাত্মাকে এবং তাঁর প্রভাবকে যে জানে তাঁর কাছে মায়ার শক্তি তুচ্ছ। কারণ প্রকৃতপক্ষে মায়ার এমন কোনো শক্তিই নেই। মায়ার বশীভূত জীবই মায়াকে শক্তিশালী মনে করে। যেমন তন্দ্রার ঘোরে মানুষ নিজের হাতকে নিজের বুকের উপর খুব ভারী বলে বোধ করে এবং সেইভাবে এতটাই ভাবিত হয়ে পড়ে যে মুখ থেকে সামান্য আওয়াজ বের করার ক্ষমতাও তার থাকে না, ভয় হয়। কিন্তু বাস্তবে সেখানে কোনো চোর নেই এবং বুকের ওপর কোনো ভারও নেই। ঠিক এই দশা হল মায়ারও। জীবের যতক্ষণ না চেতনা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ার প্রবল শক্তি মনে করে সে মায়ার বশীভূত হয়ে থাকে। যদি সচেতন হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয় এবং তাঁর স্বরূপ অবগত হয় তাহলে সেই মায়ার শক্তি জীবের নিকট তুচ্ছতায় পরিণত হয়। (এই প্রসঙ্গে গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪ নং এবং ১৩ অধ্যায়ের ২৫ নং শ্লোক দেখা যেতে পারে)। জীব পরমাত্মার সনাতন অংশ, সে নিজের শক্তি ভুলে যেতে বসেছে। এইজন্য তার কাছে মায়ার শক্তি প্রবল বলে মনে হচ্ছে। যদি এই অন্তর্নিহিত শক্তি জাগানো যায় তো মায়ার শক্তি সহজেই পরাস্ত হতে পারে। অজ্ঞানতার ফলে মায়ার প্রভাব পড়ে, অজ্ঞান নাশ হলে মায়ারও বিনাশ হয়।

প্রশ্ন—যখন সেই পরমাত্মা অন্য কোনো রূপের মধ্যে নিজরূপ দর্শন করান, সেই সময় অনেকটা আনন্দের উপলব্ধি হয়, কিন্তু সেই আনন্দে প্রকৃত আনন্দস্বরূপকে চিনতে না পারায় জীব তাঁকে পরিত্যাগ করে এবং পরে অনুশোচনা করে। জানি না, সেই অনুশোচনা আন্তরিক না মেকি। যদি আন্তরিক (আসল) হত তাহলে আনন্দস্বরূপকে ধরে রাখত ; নয় কি ?

উত্তর—ঠিকই বলেছো, মনস্তাপ আন্তরিক হলে সে ছেড়ে থাকবে কেন ?

প্রশ্ন—এই পরিপ্রেক্ষিতে জীবের মোহনাশ কীরূপে সম্ভব ?

উত্তর—সংসারের প্রতি আসক্তিই এই মোহের আসল কারণ।

বৈরাগ্যের দ্বারাই এর বিনাশ সম্ভব। পূর্ব সঞ্চিত পাপ (প্রারব্ধ) এই বৈরাগ্যে বাধা আনে কিন্তু পরমাত্মার শরণ নিলে তারও বিনাশ হয়ে যায়।

প্রশ্ন—কোন উপায়ে জীবের অন্তরে চকিতে বিদ্যুত খেলে যায় যাতে চৈতন্য হয় এবং চৈতন্য হওয়ামাত্রই সে প্রিয়তমকে আঁকড়িয়ে ধরে, কিছুতেই যেন ছেড়ে না দেয় ? সমগ্র জীবের কল্যাণের জন্য এমন কোনো সহজ সরল বিধান দেওয়া প্রয়োজন যাতে কোনো প্রলোভনেই তাঁকে না ভুলি। এবং সমগ্র বিশ্বে উদাত্ত গলায় তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যাতে সমস্ত জীব মোহের প্রহলিকা বন্ধন ছিন্ন করে আপন প্রিয়তমকে আশ্রয় করতে পারে ?

উত্তর—ভালো কথা। জপ ও সৎসঙ্গ দ্বারা পরমাত্মার (ঈশ্বরের) প্রভাবকে হৃদয়ঙ্গম করে, সংসারকে অনিত্য জেনে ঈশ্বরের ধ্যানে স্থিত হলে এরূপ হওয়া সম্ভব এবং সেই কথাই উদাত্ত গলায় (সকলকে) জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন—জোর করে উদ্ধার করে দেবার রীতিও তো আছে এবং সেইখানেই তাঁর পতিতপাবণ নামের সার্থকতা ?

উত্তর—'পতিতপাবন'—নামকরণটি বক্তার ইচ্ছাধীন। কেউ তাঁকে 'পতিতপাবন' বলে নাও ডাকতে পারে। পরমাত্মা কিন্তু সবকিছুই তাঁর নিজের নিয়মে করে থাকেন। 'পরমাত্মা'কে 'পতিতপাবন', 'দীনবন্ধু', 'দীনদয়াল' প্রভৃতি নামেতে ডেকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা অতি উত্তম। এতে কোনো দোষ নেই। এতেও প্রেম এবং করুণার ভাব বর্তমান। কিন্তু এইসব নামে সম্বোধন না করা তার থেকেও ভালো। কোনো প্রকারের খোশামুদি করবে না। তাঁর যদি গরজ হয়তো আসবেন নয়তো তাঁর ইচ্ছা (মর্জি)।

[৬]

তুমি লিখেছো যে তোমার ওপর ফৌজদারি মামলা চলছিল এবং তাও খারিজ হয়ে গেছে। —এটা আনন্দের কথা। তুমি এও লিখেছো যে তোমার ওপর আর কোনো মামলা নেই। সেটা তো আরও আনন্দের

কথা। কিন্তু যমরাজের সেই মোকদ্দমা তো সবার উপরই বর্তমান। তাকে খারিজ করতে হবে। নয়তো বড় কষ্ট। ওই মোকদ্দমার জন্য তুমি যতটা চেষ্টাশীল হয়েছিলে ততটাই যদি এই মোকদ্দমার ক্ষেত্রে হও তো অনেক লাভবান হবে। তুমি লিখেছো যে তোমার ওপর আর কোনো মামলা-মোকদ্দমা নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে পরের মোকদ্দমাটিকে কেউই গ্রাহ্য করে না। বাস্তবে এইই হচ্ছে সেই মৃত্যুরূপী ভয়ানক মোকদ্দমার ওয়ারেন্ট, যা কেউই এড়াতে পারবে না। কেবল সেই-ই পারে, যে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছে। অতএব সকলেরই ভগবানের আশ্রয়ে আসা প্রয়োজন। ভগবানের যিনি ভক্ত তিনি হলেন সৎ উকিল, বেদশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হল আইনের বইপত্র। অতএব এই উকিলের সংস্পর্শে আসা উচিত এবং (এই সংক্রান্ত) আইনের বইপত্র দেখার জন্য সময় বের করা উচিত।

এই ধরনের সাবধান বাণী পেয়েও যদি তোমার চেতনা না হয় তবে আর কবে হবে ? এই ধরনের সুযোগ সবসময় পাওয়া কঠিন।

তুমি লিখেছো অসুস্থতার কারণে তোমার শরীর নিস্তেজ থাকে—তাহলে তোমার চিকিৎসা করানো উচিত। অসুস্থতা খুবই খারাপ জিনিস, অতএব চিকিৎসার চেষ্টা অবশ্যই করানো উচিত। সাথে সাথে 'ওই' অসুস্থতাকে দূর করার জন্য যত্নবানও হতে হবে, যার দ্বারা এখনও পর্যন্ত 'জন্মমৃত্যু' হয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 'প্রচেষ্টা' ছাড়া 'ওই' অসুস্থতা দূর করা কঠিন।

পাপের ফলভোগ শেষ হলেই শারীরিক রোগভোগ আপনিই সেরে যাবে কিন্তু ভবসাগরে 'জন্মমৃত্যুরূপী' বৃথা আবর্তনকারী এই রোগ আপনাআপনি সারবে না। এর চিকিৎসা করানো অতি আবশ্যক। নিষ্কামভাবে নিরন্তর পরমাত্মার ভজন ও ধ্যান হল ভবরোগের সর্বোত্তম ঔষধ। ভগবানের ভক্ত হলেন 'নিপুণ বৈদ্য', বেদশাস্ত্র এবং ভক্তি সম্বন্ধিত গ্রন্থাদি হল 'চিকিৎসাশাস্ত্র', উত্তম কর্ম এবং উত্তম আচরণ হল 'সুপথ্য' এবং পাপাচরণই হল 'কুপথ্য'—এইরূপ জেনে এই রোগের

নাশ করার চেষ্টা করা উচিত। এর জন্য যা কিছু প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে তা কখনো বিফল হয় না। ভগবানের নামজপ এবং ধ্যানরূপ যে ঔষধ তা কখনো বিফল হয় না। শারীরিক রোগের ঔষধের জন্য অর্থাদি খরচ করতে হয় এবং তা কখনো কখনো বিফলও হতে পারে। চিকিৎসকগণও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থলোভী হন এবং রোগ সারাবার চেষ্টাও অনেক সময় ব্যর্থ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ভজন ও ধ্যানের ফল কখনও ব্যর্থ হয় না। এই ভেবে দুঃখ হয় যে মানুষ একথায় বিশ্বাস রাখে না। ভাই ! সব থেকে আশ্চর্যের কথা হল এই যে তপ্তকুণ্ডতে পড়ে থাকা ব্যক্তির মতো মানব প্রতিনিয়ত চিন্তারূপ আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, তবু সে এই দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে না। এর থেকে বড় মূর্খতা আর কী হতে পারে ?

আপনি দোকানের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলার কথা লিখেছেন, সে ভালো কথা। এই সংসারের ঝঞ্ঝাট খুব খারাপ। কাজেই এ সমস্ত মিটিয়ে ফেলাই ভালো। কোনো কাজই পিছনে ফেলে যাওয়া উচিত নয়। সংসারের কোনো কাজে মন পড়ে থাকলে পুনরায় জন্মাতে হবে—এই কথা চিন্তা করে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা উচিত যাতে চিরতরে আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। যেমন ট্রেনের টিকিট কেটে স্টেশনে মানুষ গাড়িতে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে তেমনই সবকাজ শেষ করে তৈরি থাকা উচিত, তাহলে আর চিন্তার কোনো কারণ থাকে না।

[৭]

আচরণ সম্পর্কে তুমি যা কিছু প্রশ্ন করেছ তার উত্তর নিম্নরূপ :

১) পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কুটুম্ব, শরীর এবং ধনাদিকে ভগবানের ভজন এবং সৎসঙ্গের পথে বাধা মনে করা ভুল। বন্ধন তো নিজের মনের দুর্বলতা মাত্র। মনই বন্ধনের কারণ। যদি প্রকৃত বৈরাগ্য হয়, তাহলে ঘরে থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই এবং বৈরাগ্য না হলে ঘর ছেড়ে দেওয়ায় কোনো লাভ নেই। যদি জোরদার ভজন এবং ধ্যানের সাধন চলতে থাকে এবং সাধককে যদি গৃহেই বাস করতে হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। ভজন ধ্যানের সাধন যদি বৈরাগ্য-সহিত না হয় তো তীর্থে-তীর্থে ঘুরলেও

কোনো লাভ নেই।

সৎসঙ্গে শ্রদ্ধা থাকলে স্বল্প সৎসঙ্গের দ্বারাই ভগবান লাভ হতে পা
সৎসঙ্গের জন্য আগ্রহজনিত উৎকণ্ঠা হলে পরে যদি কোনো ন্যায্য কার
সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকা না যায় তাহলে ঘরে বসেও উত্তম উপদেশ এ
সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যদি (মানুষের) সৎসঙ্গলাভের বিশেষ উৎ
থাকে, তাহলে স্বয়ং ভগবানও সাধুর বেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হ
পারেন। অতএব ধ্যান ভজন এবং সৎসঙ্গের জন্য বিশেষ আগ্রহ থ
উচিত। ভজন ধ্যান ও সৎসঙ্গের প্রভাবে মল, বিক্ষেপ এবং আবরণ
হলেই সাধকের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগ্রত হয় এবং তারপরে (সংসা
বৈরাগ্য দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় সংসারের কোনো কাজই তার ক
ভারস্বরূপ বলে মনে হয় না এবং কোনো কাজেই সে বিরক্তি বোধ ক
না। নিষ্কামভাবে সমস্ত কাজ খেলার ছলেই হয়ে যায়। এরূপ পুরুষের ক
বন অথবা গৃহ, দুই-ই সমান।

২) আপনার কী করা উচিত সে ব্যাপারে আমার মত নিম্নরূপ :

(ক) পরমাত্মাকে স্মরণে রেখে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা, নিষ্কাম কর্মযো
অনুরূপে দোকান সম্বন্ধিত সমস্ত কাজকর্ম করার অভ্যাস করা উচিত।
প্রথম অবস্থাতে এই প্রকার করা না যায় এবং আপনার দোকান
জনসাধারণের হিত সাধিত হয় তাহলেও আপত্তির কোনো কারণ
নিজের লক্ষ্য সর্বদাই কর্তব্যের প্রতি থাকা উচিত, লোভের প্রতি নয়।
ধরনের আচরণের পরিণাম শুভ হওয়ারই আশা করা যেতে পারে।

(খ) ছয় ঘন্টা সৎসঙ্গ করা উচিত অথবা শাস্ত্রের উপদেশ অনু
নিষ্কাম ভাবে নির্জন স্থানে জপসহ নিরন্তর ধ্যানের সাধন করা উচিত।

(গ) আনুমানিক ৬ ঘন্টা ধ্যানস্থ হয়ে ঘুমানো উচিত।

(ঘ) অবশিষ্ট সময় তুমি ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারো কিন্তু প্র
কাজ স্বরূপের ধ্যান ও জপের চেষ্টার সঙ্গে করা উচিত। জপ ও ধ্যান
একসঙ্গে না হলে, মনে মনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কিংবা বাণীর মাধ্যমে অ
পরমাত্মার নাম স্মরণ করা উচিত।

৩) 'কাজ না করার জন্য লোকলজ্জার' কথা তুমি লিখেছো। হ্যাঁ সে কথাও এক দৃষ্টিতে সত্যি, কিন্তু কর্তব্যের ত্যাগ হলেই বিশেষ ক্ষতি হয়। ভগবান গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪৭ নং শ্লোকে[১] বলেছেন যে, কর্মের ত্যাগ কখনো করা উচিত নয়। কারণ কর্তব্যের ত্যাগ, লোক-পরম্পরার দৃষ্টিতে খুবই ক্ষতিকর।

৪) তুমি লিখেছো 'জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কাজ করার প্রয়োজন নেই'—সে কথা অতি উত্তম কিন্তু স্বার্থবিহীন কাজ করতে গিয়ে মন যদি প্ররোচিত না হয় তাহলে ভজনায় ছেদ পড়ার কারণ কী ? যদি অভ্যাসের ত্রুটির জন্য এরূপ হয়ে থাকে তাহলে অভ্যাসের দ্বারা সে ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

৫) শোক-তাপ বিষয়ক কথোপকথনে এবং চিঠিপত্রাদির দুঃসংবাদের মাধ্যমে হৃদয় উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ হল অন্তরের দুর্বলতা বা আত্মবলের অভাব। বাহ্যিক ব্যবহারে শোকের প্রকাশ কিছুটা অবশ্যই হওয়া উচিত কিন্তু অন্তঃকরণে (হৃদয়) উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

৬) যাই ঘটুক না কেন, সব কিছুকে ভগবানের লীলামাত্র মনে করে ভগবৎ স্বরূপে স্থিত থেকে নির্বিকার এবং স্থিতধী হওয়ার অভ্যাস করা উচিত। সময়কে অমূল্য বস্তু বলে জানা উচিত। সময়ের অমূল্যতার রহস্য হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পরে আর কিছুই (বোঝার) বাকী থাকে না।

৭) যে ব্যক্তি শরীর থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে এবং শরীর দ্বারা ঘটিত কর্মের সাক্ষী হয়ে যে কাজ করে তার হৃদয়ের কখনো বিকার ঘটে না। যদি বিকার ঘটে তাহলে জানতে হবে তার অবস্থিতি শরীরে রয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধ্যায় ১৪, শ্লোকসংখ্যা ১৯[২]-এ যা বলা

---

[১] কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

[২] নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

যখন দ্রষ্টা তিনটি ভিন্ন অন্য কাউকে কর্তারূপে দেখেন না এবং তিন গুণের

হয়েছে তার রহস্য শ্রী .... কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। নারায়ণের স্বরূপের যে কোনো প্রিয় রূপের ধ্যানে তাঁর নামকে আশ্রয় করে মগ্ন থাকা উচিত। আনন্দ না হলেও, আনন্দের ভাবের কল্পনা করা উচিত ; একদিন সত্যিকারের আনন্দ লাভও হতে পারে।

৮) সমস্ত সংসারকে এক কল্পিত আনন্দঘনরূপে কল্পনা করে সমস্ত (জগৎ)কে আনন্দে পরিপূর্ণ মনে করা উচিত, যেমন জলে ভাসমান বরফখণ্ড আসলে জলেই পূর্ণ, তেমনই সবকিছুকে সেই আনন্দঘন পরমাত্মায় এবং পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ মনে করবে।

৯) যে কোনো উপায়েই এই জ্ঞান জাগ্রত করতে হবে যে শরীর মিথ্যা ও বিনাশশীল এবং আত্মার এই দেহের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। যা কিছুই ঘটুক না কেন অন্তঃকরণে যেন বিন্দুমাত্র বিকার না আসে, সর্বদা বেপরোয়া থাকবে। সর্বদা গীতার ২য় অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৭১[১] এর ভাবে ভাবিত থাকবে। কখনো যদি কোনো শোকপূর্ণ ঘটনা ঘটে তাহলে তাহলে গীতার ২য় অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকের[২] অর্থ উপলব্ধি করতে হবে, এর অর্থ বোধগম্য হলে শোক ও চিন্তা টিকতেই পারে না।

অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বত জ্ঞাত হন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

[২]বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমত্বশূন্য ও অহং-বর্জিত এবং নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বরপ্রাপ্ত।

[১] অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় এমন মানুষদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতের মতো কথাও বলছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত—কারো জন্য শোক করেন না।

[৮]

জীবনে উত্তম আচরণ পালনের জন্য তুমি বিশেষরূপে চেষ্টা করবে। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই উত্তম ব্যবহার সম্ভব। অতএব ধ্যান ভজন ও সৎসঙ্গের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা থাকা উচিত। ভুলক্রমেও সংসারের তুচ্ছ ভোগ্য বস্তুর প্রতি মন দেওয়া উচিত নয়। সাংসারিক ভোগে যে সময় অতিবাহিত হয় (খরচ হয়) তা ব্যর্থ খরচ। এরূপ জেনে একমাত্র সত্যিকারের প্রেমী পরমাত্মার ধ্যান ভজনের আশ্রয় নেওয়া উচিত। সময় খুবই কম। খুবই সতর্কতার সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত। যদি পলকমাত্র সাধনায় ত্রুটি থেকে যায় তো পুনর্জন্ম হয়ে যাবে। অতএব চেষ্টা এমনভাবেই করা উচিত যাতে অতি শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়।

[৯]

[এই পত্রেও প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন লিখে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে—সম্পাদক।]

প্রশ্ন—নিরন্তর স্বরূপে স্থিতি হলে শরীর ও অন্তঃকরণ দ্বারা অন্য কাজকর্ম হওয়া সম্ভব কি ? যদি (সম্ভব) হয়, তাহলে কি ওই সময় এবং ততক্ষণ সময়ের জন্য কি 'স্বরূপের' বিস্মৃতি হয় ? স্বরূপের বিস্মৃতি না হয় এবং অন্যান্য কাজও সঠিকরূপে সম্পাদিত হয়—ইহা কী প্রকারে সম্ভব ?

উত্তর—নিরন্তর স্বরূপে স্থিত হয়েও (ব্যষ্টি চেতনের সমষ্টি চেতনের সঙ্গে একীভূত হয়ে) অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত কর্তব্য কর্মে কোনো বাধা পড়ে না। ওই সময়ে ভগবৎস্বরূপে স্থিত পুরুষের স্থিতিতে কিছুমাত্র পার্থক্য হওয়ার কোনো কারণ থাকে না, কেননা ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষের অন্তঃকরণের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে (নিজের) কোনো সম্বন্ধ থাকে না।

সাধারণের দৃষ্টিতে সে তার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব কার্য সাধিত করছে এমন প্রতীত হলেও বাস্তবে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সমষ্টি চেতনের সত্তায় পূর্বের অভ্যাস অনুসারে সম্পাদিত হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন :

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্মণাং তমাহু পণ্ডিতং বুধাঃ॥ (৪।১৯)

যাঁর সমস্ত শাস্ত্রসম্মত কর্ম কামনা ও সংকল্পবর্জিত—এবং যাঁর সকল কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে, এরূপ পুরুষকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও পণ্ডিত বলে অভিহিত করে থাকেন।

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্॥ (৫।১৩)

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন।

প্রশ্ন—পরমাত্মাকে লাভ করার পর সেই পুরুষের কাম-ক্রোধ ইত্যাদি হয় কী না ? যদি না হয় তাহলে মহর্ষি লোমশ কাকভূশণ্ডিকে কী করে অভিশাপ দেন এবং ভগবান শিব কামার্ত হয়ে মোহিনীর পিছনে ধাওয়া করেন, এরূপ আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়—এর উত্তর কী ? লোকে বলে কাম-ক্রোধ থাকলেও নাকি স্বরূপের স্থিতিতে কোনো অন্তরায় হয় না !

উত্তর—পরমাত্মাকে লাভের পর, অহংকারবর্জিত শুদ্ধ অন্তঃকরণে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দুর্গুণ উৎপন্ন হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। মহর্ষি লোমশের যদি বাস্তবে ক্রোধ উৎপন্ন না হয়ে থাকে, এবং শুধুমাত্র শাস্ত্রানুসারে কারো ভালোর জন্য ওই ধরনের আচরণ করে থাকেন তাহলে কোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু যদি ধরা যায় যথার্থই তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর তখনও ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটেনি। এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই কাকভূশণ্ডি বলেছেন—ক্রোধ কি দ্বৈত বুদ্ধি বিনু..............।

ভগবান শংকর (মহাদেব) সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়, ভগবান বিষ্ণু এবং শিব স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁদের কাজের মর্ম বোঝা মানুষের বুদ্ধির বাইরে। ঈশ্বরের লীলা বোঝবার শক্তি মানুষের নেই। লোকে বলে শুধুমাত্র কাম-

ক্রোধ প্রভৃতি থাকলেও স্বরূপের স্থিতিতে কোনো বাধা আসতে পারে না—কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এর স্বপক্ষে কোনো প্রাচীন মহর্ষি কথিত প্রামাণিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। বরং এর বিরুদ্ধে তো অনেক প্রমাণ আছে। গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৪৩ এবং ১৬ অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ২১ ও ২২ এবিষয়ে উল্লেখ্য। এছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন—পরমাত্মা তো প্রাপ্তই রয়েছেন, কেননা কোনো কালেই আত্মস্থিতির অন্যথা হয় না। কেবলমাত্র ভ্রম ছিল, যা লুপ্ত হয়ে গেছে। স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেছে। তারপরে যা পূর্বে ছিল তাই রয়ে গেছে। 'অতএব আগে প্রাপ্তি ঘটেনি , পরে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি ঘটেছে'—এই কথা কী করে বলা যেতে পারে ?

উত্তর—আত্মার নিজ স্বরূপের সঙ্গে সর্বদাই একই ধরনের স্থিতি রয়েছে, সেই কারণে যিনি পরমাত্মাপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর কখনো এই ধারণা হয় না যে আগে আমার অজ্ঞান (অবস্থা) ছিল এবং পরে অমুক সাধনার দ্বারা অমুক সময়ে জ্ঞান হয়েছে। তথাপি যিনি অজ্ঞানী তাঁর অজ্ঞানতা কাটাবার জন্য সাধনার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাঁদের অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়ে গেছে অথবা স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় সাংসারিক ভাব বিনষ্ট হয়েছে, তাঁদের অন্তরে কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দোষ কী করে থাকতে পারে ? যে পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে তাঁর কী আর স্বপ্নের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে ? স্বপ্ন না থাকলে কি স্বপ্নে থাকা কাম ক্রোধাদি বর্তমান থাকে ?

প্রশ্ন—প্রারব্ধ অনুসারে ফলের ভোগ করতেই হয়, প্রারব্ধের ভোগান্তি ছাড়া প্রারব্ধ নাশ হয় না। জীবন্মোক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধের ভোগ করতে হয়।

যদি মানুষ খারাপ কাজ না করে তাহলে সে খারাপ ফল কেন ভোগ করে ? অতএব কামনা বা ইচ্ছা না হয়েও প্রারব্ধের প্রবল পরাধীনতায় শুধুমাত্র প্রারব্ধ কর্ম ভোগের জন্য মানুষকে খারাপ কাজ করতে হয়। এর

ফলে জ্ঞানেতে অথবা স্বরূপের স্থিতিতে কী বাধা আসতে পারে ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো কর্মেরই অবশেষ থাকে না। এক পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছুর অস্তিত্ব যখন তাঁর দৃষ্টিতে নেই, তাহলে কোনো কর্মের ফল তিনি কী করে ভুগবেন ? তবুও শাস্ত্র এবং লোকদৃষ্টি অনুসারে সেই পুরুষের অন্তঃকরণ (মন) ও ইন্দ্রিয় মাধ্যমে প্রারব্ধের ফল ভুগবার মতো পরিলক্ষিত হয়—একথা ঠিকই। সুতরাং একথা অবশ্যই মানতে হয় যে তাঁর দ্বারা প্রারব্ধজনিত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতেই পারে না যা পাপ কর্ম ছাড়া ভোগা যাবে না। যদি পাপ কাজের জন্য 'প্রারব্ধ'কে কারণ বলে মানা হয় তাহলে তিন ধরনের আপত্তির কথা উঠতে পারে—

(১) শাস্ত্রে উল্লেখিত বিধি-নিষেধের উপদেশ ভ্রান্ত (ব্যর্থ) প্রতিপন্ন হয়।

(২) ঈশ্বর যে 'ন্যায়শীল' একথা ভ্রান্ত (ভুল) প্রমাণ হয়। যদি বিধাতা প্রারব্ধে পাপ করার বিধান করে থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি সেই পাপের জন্য দণ্ড কেন ভোগ করবে ? তাছাড়া একথাও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না যে একটি অপরাধের ফল ভোগ করতে গিয়ে পুনরায় অন্য একটি অপরাধের বিধান দেওয়া হবে। পাপ অথবা অপরাধের ফলস্বরূপ 'দুঃখ ভোগ' হতে পারে কিন্তু পুনরায় পাপকর্ম হতে পারে না।

(৩) যার দ্বারা চুরি, ব্যাভিচার ইত্যাদি কামক্রোধাদি যুক্ত নীচ কর্ম ঘটে, তাকে কীভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মানা যায় ? তাকে তো নীচ-ব্যক্তি বলেই মানতে হবে। যখন মল, বিক্ষেপ ও আবরণ—এই তিন দোষের বিনাশ হয়ে শুদ্ধ অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, তখন সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণে কামক্রোধের ন্যায় খারাপ জিনিসের উদ্ভব কী করে সম্ভব ? অতএব আমাদের এই কথা মানতেই হবে যে পরমাত্মা প্রাপ্তির পরে প্রারব্ধ কর্মের অবশিষ্ট রয়ে যাওয়ার ফলে কামক্রোধাদি যুক্ত নীচ আচরণ হওয়া সম্ভব—এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। আসক্তিই হল কাম ক্রোধাদির উৎপত্তির

একমাত্র কারণ, (গীতায় ২য় অধ্যায়ের ৬২, ৬৩ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)[১] এবং আসক্তির সম্পূর্ণ (সর্বথা) অভাবের পরেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়ে থাকে। (গীতার ২ অধ্যায়ের ৫৯ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)[২] যখন কারণের অভাব হয়ে গেছে তখন কার্য আর কোথা হতে উৎপন্ন হবে ?

[১০]

মনের শয়তানির কথা লিখেছেন, সে কথা ঠিকই। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। প্রেম এবং আনন্দের সঙ্গে নিরন্তর পরমাত্মার নামের স্মরণ-মনন যাতে হয় তার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। ধ্যানের সময় যদি আলস্য ভাব আসে তাহলে চোখ খুলে রাখা উচিত। তবুও যদি আলস্য দূর না হয় তাহলে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এতেও যদি আলস্য থাকে তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি (পদচারণা) করতে করতে নাম-জপ করা উচিত। যদি কোনো উপায়েই আলস্য দূর না হয় তাহলে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত। অধিক আলস্যের কারণ হল ভগবানের প্রতি প্রেমের (ভালোবাসার) ঘাটতি এবং পাপের আধিক্য। ভগবানের নাম-জপ ও সৎসঙ্গের তীব্র অভ্যাস ব্যতীত কলিযুগে পাপের নাশ হওয়া কঠিন, যথেষ্ট ভজনা হলে এই বোধ জাগ্রত হয় যে এই সংসার কালের দ্বারা প্রত্যক্ষ ক্ষয় হয়ে চলেছে। সৎসঙ্গের আধিক্যে ভজনাও অধিক হয়। অধিক ভজনা হলে ভগবানে ভালোবাসা (প্রেম) ও সংসারে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য জাগলে কোনো প্রচেষ্টা ব্যতীতই পরমাত্মার ধ্যান হতে থাকে। তখন আর ধ্যানের জন্য বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হয় না।

---

[১]ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

[২]বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯

চিঠিতে আমার লেখা কথাগুলি সঠিক ধারণা হচ্ছে না, তাই আমার উপর (পত্র লেখকের প্রতি) শ্রদ্ধার ঘাটতি রয়েছে—এমন কথা লিখেছো। ভাই ! আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। শ্রদ্ধার যোগ্য হলেন একমাত্র ভগবান, অতএব তাঁর উপরে এবং তাঁর কথায় শ্রদ্ধার কোনো ত্রুটি রাখতে নেই।

অভিমান ও তৃষ্ণার পরিব্যপ্তির বিনাশ হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো। ভগবানের নামজপ এবং মহাপুরুষ সঙ্গই সব থেকে সুলভ এবং উত্তম উপায়। একমাত্র ঈশ্বরের নামের দ্বারাই সমস্ত দোষ নষ্ট হয়ে যায়, দোষ টিকে থাকার জায়গাই থাকে না। কোনো ব্যক্তি ভগবানের নাম পরায়ণ হলে পরে তাঁর আর অন্য কোনো উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা থাকে না। ভজন ও সৎসঙ্গের চর্চা বৃদ্ধি হলে ভগবানের মর্ম উপলব্ধি হয়। এই মর্মজ্ঞান থেকে যখন ঈশ্বরে পূর্ণ প্রেম হয়ে যায় তখন আর সেই প্রেম দেহে (শরীরে) টিকে থাকতে পারে না। দেহে যখন প্রেমই থাকবে না, তখন মান সম্মান বড়াই-এর প্রশ্নই আসে না।

তুমি লিখেছো যে 'ভগবানের পূর্ণ কৃপা হওয়া সত্ত্বেও বদ্‌গুণগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হচ্ছে না।' তোমার কথা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে যে ঈশ্বরের পূর্ণ কৃপার প্রভাব এখনও তোমার অনুভূত হয়নি। ঈশ্বরের কৃপার নিরন্তর অনুভব হতে থাকলে এবং নিজেকে তাঁর কৃপাপাত্র জ্ঞান করলে তখন দুঃশ্চিন্তা থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তৎসত্ত্বেও যদি চিন্তা থেকে যায় তাহলে তা স্বয়ং প্রভুকেই লজ্জিত করবে। বাস্তবে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ ভগবৎ কৃপা মানা হয়নি। না মানলে 'ফল' হয় না। ভজনার যথেষ্ট অভ্যাস না হলে সাংসারিক ও লৌকিক কথাবার্তা বলার সময়ে ভগবানের প্রীতিতে অন্তরায় হতে পারে। বাস্তবে সেই কৃপাময়ের কৃপা তো সকলের উপরই পরিপূর্ণ। মানুষ কৃপা করার কে ?

যদি ভালোবাসার সঙ্গে নিরন্তর ভগবানের নামজপ স্বত না হয় তাহলেও বিনা প্রেমেই করা উচিত। জপের প্রভাবে প্রেম স্বতই উৎসারিত হতে পারে। তুমি লিখেছো যে অনেকের সাধন অবস্থা দেখে ভালো মনে

হচ্ছে, সে তো ভালো কথা। অন্য ব্যক্তির ভজনধ্যানের তীব্রতা লক্ষ্য করাও অনেক সময় লাভদায়ক ফল এনে দেয়। অন্যের অবস্থা দেখে নিজের সাধন তীব্র করার আগ্রহ জাগে। আগ্রহের ফলে সাধনে তীব্রতা আসে। এতে ভজনার বৃদ্ধি হয় এবং ভজনার আধিক্যে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলেই 'ধারণা' হয়। ভাই হরিরাম ! তোমার কখনোই এই নামকে ভুলে থাকা উচিত নয়। কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। পরমাত্মার নিষ্কাম প্রেম-ভক্তিতে মগ্ন থাকা উচিত। ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া উচিত নয়, শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার প্রার্থনা করা উচিত। একমাত্র ভগবানই ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। প্রেমের প্রকৃত মর্ম একমাত্র তিনিই জানেন। সংসারে প্রেমের সমান আর কোনো বস্তু নেই। সেই প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করার জন্যই পরমাত্মার সঙ্গে মৈত্রী থাকা প্রয়োজন। মিত্রভাব খাঁটি (প্রকৃত) হওয়া প্রয়োজন। প্রিয়তম মিত্রের জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত। এমন প্রেমিকই ভগবানের আদরের। ঈশ্বর ভালোবাসার অধীন, প্রেম তার রজ্জুতে ভগবানকে বাঁধতে পারে। ভগবান তাঁর 'প্রেমীর' সঙ্গ কখনো ত্যাগ করেন না। তাঁকেই খাঁটি প্রেমিক বলে মানা হয় যিনি প্রেমের জন্য আত্মসমর্পণ করতে পারেন। তিনি নিজ শরীর মন এবং ধনসর্বস্বকে নিজ প্রেমাস্পদের সম্পত্তি বলে মনে করেন। কোনো বস্তু নিজ প্রেমীর কাজে লাগলে যিনি সার্থকতা অনুভব করেন, সেই-ই যথার্থ প্রেমী। এমন প্রেমীই সর্বতোভাবে পূজনীয়।

[১১]

নামজপ বেশিক্ষণ ভুলে থাকা উচিত নয়। যে মুহূর্তে (সময়ে) নাম স্মরণে আসবে তখনই 'নামহীন' হয়ে থাকার জন্য অনুশোচনা আসা উচিত। মনে মনে বলতে হবে 'হে প্রভু ! আমার এতটা সময় বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। আমার অসাবধানতার জন্য ঠকে গেলাম। হে ঈশ্বর ! আমি তোমার শরণাগত। তুমি অনাথের একমাত্র আশ্রয়। আমি শুধু নামমাত্রই নিজেকে অনাথ বলছি কিন্তু তুমি তো করুণার সাগর। (সেই কথা মনে করে) তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমার ধৈর্যের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু যখন আমি

নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন সাহস হারিয়ে ফেলি আবার যখন তোমার স্বভাব, সুহৃদ্যতা, দয়ালুতার এবং ভালোবাসার কথা ভাবি তখন আবার সাহস ফিরে পাই।' এইভাবে আর্দ্র হৃদয়ে করুণাপ্রার্থীর ভাব নিয়ে অশ্রুপাত করে পরমাত্মার কাছে যদি প্রার্থনা করা হয়, তাহলে অন্তরের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। সে সব ব্যক্তির (হৃদয়ে) প্রেম প্রবল তাঁদের প্রেমাশ্রুপাত তো হয়ই উপরন্তু তাঁদের কখনো ধৈর্যের অভাব হয় না।

নামজপ করার সময় নারায়ণের স্বরূপকে চিন্তা করে, তাঁর স্তুতি করে প্রার্থনা করা উচিত এই বলে যে, 'প্রভু, তুমি থাকতে যদি আমার দুর্গতিও হয় তো আপত্তি নেই, তবুও যেন তোমাকে স্মরণে রাখতে পারি। এতে যতই শারীরিক ক্লেশ হোক না কেন, তোমার চিন্তা ছেড়ে আমি অন্য কোনো সুখ চাই না। প্রভু কবে তুমি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হবে ? যেসব লোক তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তারা ধন্য। আর যারা এরূপ নয় তাদের তো মনুষ্য-জন্ম সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

[১২]

সাধনাকে প্রবল করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সাহস (উদ্যম) হারানো উচিত নয়। যতটা তোমার মধ্যে শোধন সম্ভব হয়েছে, ততটা তোমার পরম লাভ হয়েছে। এখন ভবিষ্যতে আরও উত্থানের জন্য আরও সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বে হাজার হাজার বছরের নিরন্তর চেষ্টার ফলে ভগবানের দর্শন পাওয়া যেত কিন্তু এখন তো অতি শীঘ্রই তা সম্ভব। হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত তোমার যে ধরনের সাধন চলছে তাতে হয়তো অনেক সময়ই লাগবে। অতএব এখন তোমাকে খুব জোরের সঙ্গে সাধনাতে লাগতে হবে। নারায়ণের সাক্ষাৎ (দর্শন) ছাড়াই যদি এই স্থান (এই পৃথিবী) থেকে যেতে হয় তো বড়ই ক্ষতিকারক হবে। অনেক পুণ্যের ফলে 'মনুষ্যদেহ' লাভ হয়। এবং তা কেবলমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনা করার জন্য প্রাপ্ত হয়েছে। মূর্খলোকেরা একে (এই জন্মকে) পতঙ্গের মতো, সাংসারিক ভোগের দুঃখদায়ী অগ্নিতে প্রজ্বলিত করে ভস্মে পরিণত করে,

তোমার এরূপ করা উচিত নয়। সাংসারিক ভোগকে অগ্নিসদৃশ মনে করে তার থেকে বাঁচা উচিত। তোমার ভিতরে সাংসারিক ভোগাসক্তি-জনিত দোষ বিশেষরূপে বর্তমান, এইজন্যই তোমাকে এই সাবধানবাণী শোনাচ্ছি। তোমার নিজের সমস্ত শক্তি সাধনায় ডুবিয়ে দেওয়া উচিত। নয়তো পরমাত্মার সাথে মিলন কী করে হবে ? তোমার ভিতরে অনেক ক্ষমতা (শক্তি) আছে, সেটা তোমার কাজে লাগানো উচিত এবং কোমর বেঁধে সাধন করা উচিত। যদি এতেও তোমার ভগবৎদর্শন না হয় তাহলে তোমার কোনো দোষ নেই। বুঝতে পারছি না, এই তুচ্ছ সংসারের বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য ভোগের লোভে পড়ে তুমি অমূল্য সময়কে কীসের জন্য ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছ ? তোমার নিজের মনকে প্রশ্ন করা উচিত যে কেন সে আত্মউদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করছে না ? এত দুর্বুদ্ধি কোথা থেকে এল ?

[১৩]

সংসারে অত্যন্ত প্রবলতার সঙ্গে নারায়ণের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করা উচিত। সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রবল ভক্তি প্রবাহ ছাড়া কী করে সফল হবে ? এই সংসারে তোমরা কী কারণে এসেছো ? সেকথা খেয়াল রাখা উচিত। উদ্দেশ্য সব থেকে উঁচু (শ্রেষ্ঠ) রাখা উচিত। সংসারের সমস্ত ব্যক্তিকে ভগবৎ ভক্তিতে স্থাপনা করা এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের পরম কর্তব্য। যারা ভগবানকে অপ্রাপ্ত বলে মনে করে, তাদের বিশ্বাস জাগাবার জন্য এবং ঈশ্বরে প্রেম (ভালোবাসা) জাগাবার জন্য নামজপের প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। যিনি একথা জানেন যে ঈশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং তিনি সকল মানুষের আত্মাস্বরূপ—তিনিই মহাত্মা। তাঁর কাছে ভগবান সর্বত্র প্রত্যক্ষ বর্তমান। তাঁর আর করার কিছুই বাকী নেই। এইসব ব্যক্তিগণ যা কিছু করে থাকেন, সবই লোকহিতের জন্য। যাঁর এই 'ভাব' এখনও হয়নি তাঁরও এইভাবে সাধনা করা উত্তম। উত্তম পুরুষের কর্মের অনুকরণ করাও উত্তম।

[১৪]

ভগবানের স্মৃতি সর্বদা স্মরণে রাখার জন্য ভজন-ধ্যান ও সৎসঙ্গের

তীব্র চেষ্টা করা উচিত। তুমি লিখেছো যে জপে অনেক ভুল হয়ে যায়। এই ভুল শীঘ্র দূর করা উচিত। 'ভুল' শোধনের ইচ্ছা হওয়া তো অতি উত্তম কথা। 'ভুল' কেন সংশোধন হয় না—একথা তোমার বিচার করে দেখা উচিত। 'ভুল সংশোধনে'র পুরো (পূর্ণ) চেষ্টা করা হলেই ভুল সংশোধন হতে পারে। 'সংসার', 'ভোগ' এবং 'দেহ'—এদের সর্বদাই মৃত্যুর মুখে (অপেক্ষমান) দেখা উচিত। ঈশ্বরকে যদি সৎ-রূপে সর্বত্র দেখার চেষ্টা থাকে তাহলে এই 'ভুল' কম হতে পারে। দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসের জন্য এই মিথ্যা সংসার সত্য বলে প্রতীত হয়। বাস্তবে 'সংসার' বলে কোনো বস্তু নেই, সর্বত্র কেবল এক সচ্চিদানন্দেই পরিপূর্ণ, কিন্তু বিশ্বাস হতে হবে। ভগবান সর্বত্র রয়েছেন (অবস্থিত রয়েছেন)—এরূপ বিশ্বাস হওয়া চাই। অধিক জপ, ধ্যান এবং সৎসঙ্গের দ্বারাই এই মান্যতা সম্ভব। যাঁরা সর্বদা সংসারকে দৃঢ়রূপে আঁকড়ে আছেন, তাঁদের সর্বদা ভগবানের চিন্তা কী প্রকারে সম্ভব ? যদি সর্বদা (ভগবৎ সাক্ষাতের) লালসা অন্তরে জাগ্রত থাকে তাহলে নিরন্তর ভগবানের স্মরণ হওয়াও কোনো বড় কথা নয়। সাংসারিক কর্ম করাকালীন এই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারকেও মৃত্যুর মুখে বিনাশশীল অনুভব করতে (দেখতে) থাকলে নামের স্মৃতি অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকা সম্ভব। সংসারকে মিথ্যা জেনে, প্রসন্ন চিত্তে, হাস্যবদনে ; ভগবানকে সদা স্মরণে রেখে, খেলার ছলে কাজকর্ম করা উচিত অথবা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্বব্যাপী স্বরূপে স্থিত হয়ে, 'নিজেকে' (আত্মাকে) 'দেহ' হতে আলাদা করে দ্রষ্টারূপে সাংসারিক কর্ম করা উচিত।

গীতার ১৪ অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুসারে সাধন করা উচিত।

ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধির উপায় জিজ্ঞাসা করেছো। ভগবানের মহত্ত্ব জানার পর যখন তীব্র ইচ্ছা হতে থাকে তখন প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং তারপর ভগবান-প্রাপ্তি ঘটে। অর্থ উপার্জনের জন্য যত চেষ্টা করা হয়, তার থেকে যদি অধিক চেষ্টা ভগবৎ-মিলনের জন্য করা যায় তো ঈশ্বর-প্রাপ্তি সম্ভব।

তুমি লিখেছো যে অত্যধিক কথা বলতে হয় তথা কাজকর্ম অধিক দেখাশোনা করতে হয়—তো এতে ক্ষতি কী ? ভগবানের স্বরূপে স্থিত হয়ে, তাঁর নামের স্মৃতি (হৃদয়ে) জাগ্রত রেখে, প্রসন্ন মনে, সচেতন হয়ে কথা বলা উচিত। যদি এরূপ করা যায় সে বড় আনন্দের কথা। অভ্যাস করলে এমন অবস্থা হওয়া সম্ভব। ভগবানে এমন প্রেম হতে হবে যে তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত যেন প্রাণে শান্তি না আসে। এরূপ হলে কখনো ভুল হতে পারে না। যদি সংসারের প্রতি আসক্তি একেবারে দূর না হয় তাহলেও চিন্তার কারণ নেই কিন্তু সর্বদা ভগবৎ-নামের স্মরণ এবং তাঁর স্বরূপ চিন্তা হওয়া উচিত, তারপর আপনাআপনিই সংসার থেকে সরে ভগবানে 'প্রেম' হওয়া সম্ভব। সর্বত্র এক 'নারায়ণ'ই পূর্ণরূপে বিরাজমান। নারায়ণ ছাড়া আর কিছুই নেই। 'সংসারে সব মিথ্যা'—এই কথা জেনে, নিরন্তর নারায়ণের চিন্তার আশ্রয় নেওয়া উচিত। সংসারে কোনো বস্তুর ইচ্ছা কখনো করা উচিত নয়। সর্বদা ভগবানের ধ্যান-আনন্দে আনন্দমগ্ন থাকা উচিত।

যা কিছু সংসারে হয়, সবই ভগবানের বিধানে হয়—এই কথা জেনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তাতেই প্রসন্ন থাকা উচিত। চিত্তে কোনোরূপ চিন্তা অথবা কোনোপ্রকারের ইচ্ছা হলে, 'শরণাগত'ভাবে দোষ এসে যায়। সব কিছু তাঁরই সংকল্পিত, সেই ভগবান যা চান, তাই করেন। এতে বিকার আসার কোনো কারণ নেই। ভগবানের বিধানে, নিজের কোনো দাবি পাওনার ভাব না থাকলে বৈরাগ্য এবং সৎসঙ্গে প্রেমের বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

বিশ্বাসপূর্বক ভজন, ধ্যান এবং সৎসঙ্গের চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। এরূপ করতে থাকলে ভগবানের মর্ম জানা যায়। এরপরে বিনা চেষ্টাতেই ভজন-ধ্যান হতে থাকে। অতএব প্রথমে অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের মর্ম জানো। বিশ্বাস থাকলে তবেই অধিকতর প্রচেষ্টা হয়। মর্ম উপলব্ধি না করা পর্যন্ত যদি সংসারে আসক্তি থেকে যায় তাহলেও চিন্তা নেই। প্রসন্নচিত্তে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে স্মরণে রেখে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা নাম করতে

থাকো। অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলে ভগবানের কৃপার প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা জন্মে, খুব সূক্ষ্মরূপে বিচার করলে ভগবানের কৃপা, দয়া ইত্যাদি গুণের অনুভব হয়। ভজন-ধ্যান-সৎসঙ্গ ইত্যাদি সবই ভগবৎকৃপায় সম্ভব হয়। অন্তঃকরণের শুদ্ধি ভজন-ধ্যান-সৎসঙ্গ থেকেই হয়। মানুষের তীব্র ইচ্ছার আধার অনুযায়ী সর্বদা 'ভগবানে প্রেম হওয়া' এবং 'সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য' হওয়া নির্ভর করে। যতক্ষণ না এই বিষয়ে পুরো আনন্দ উপলব্ধি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত করার চেষ্টা করা উচিত।

ভগবানের চরণকমলরূপী নৌকার আশ্রয় তথা ভগবানের নাম-জপরূপী রশির (দড়ির) আধার সর্বদা জাগিয়ে রাখার উপায়ই হল 'তীব্র ইচ্ছা'। সময় বয়ে যাচ্ছে। শীঘ্রই এই শরীর পঞ্চভূতে মিশে যাবে, যখন শরীরই নিজের নয়, তো টাকা পয়সা এবং সংসারের ভোগের তো কথাই আলাদা।

অতএব তোমার একপলকও দেরী করা উচিত নয়। তোমার এমন কী কাজ রয়েছে যা ভগবানের প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটাচ্ছে ? ভগবানের বিচ্ছেদ তোমার সহ্য হচ্ছে তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে লিখতে হচ্ছে যে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রভাব তোমার জানা হয়নি। এই টাকা পয়সা, স্ত্রী তথা সংসারের যাবতীয় ভোগ এবং ভোগ্যবস্তু তোমার কোন কাজে আসবে ? এখন অন্তত জেনে বুঝে ধোঁকায় থাকা উচিত নয়।

এমন কী বাধা আছে যা নারায়ণের সঙ্গে প্রেমের বাধা হয়ে রয়েছে ? তুমি যার জন্য ধ্যান-ভজনে বিলম্ব করছো সে সমস্ত তোমার কিছুই কাজে আসবে না। তুমি যা কিছুকে নিজের বলে মনে করছো, সে সব কিছুই তোমার নয়। তোমার বলতে তো এক নারায়ণই আছেন। অতএব তোমার তাঁরই শরণ নেওয়া উচিত, আর সব মিথ্যা। যেমন তুমি তোমার নিজের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো বস্তু দেখতে পাও না, তেমনই ভগবানেও তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বপ্নে যা কিছু ভাসমান, বাস্তবে তার কিছুই নেই। ঠিক সেই প্রকার সংসারে যা কিছু ভাসমান বোধ হয় সেগুলি কিছুই নয়। 'যেখানে তুমি আছো সেখানে এবং তোমার ভিতরে তুমি ছাড়া দ্বিতীয়

কিছুরই আংশিক অনুমান পর্যন্ত করা যায় না'—এর অর্থ যদি তুমি বুঝতে না পারো তাহলে কোনো সময়ে সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করে নিও। ঈশ্বরে অস্তিত্বের (সত্তার) ভাবকে এইভাবে লেখা হল। শরীরের অনেক প্রকার বিকার হয়। অন্তঃকরণেও বিকৃতি হয়। কিন্তু যেখানে 'আপনি' (সত্তারূপে) আছেন সেখানে কোনো বিকার নেই। আপনার বাইরে ও ভিতরে কোনো বিভেদ নেই। যেখানে আপনি (স্বয়ং) অবস্থিত সেখানে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর স্থান নেই। এইভাবে ভগবানের আনন্দ স্বরূপ অস্তিত্বের ঘনত্ব রয়েছে। এক সেই সচ্চিদানন্দঘন ছাড়া আর কিছুই নেই—এরূপ মানা উচিত। বাস্তবে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নেই। বিশ্বাস এই প্রকার করা উচিত যে সর্বত্রই একমাত্র ভগবানই আছেন। যদি এরূপ অনুভব হয় তাহলে সর্বত্র ভগবানই পরিলক্ষিত হবেন। এরপরে কখনো যদি সংসারের চিত্র ভেসে ওঠে তাতে কোনো আপত্তি নেই। যদি সর্বদা এইরূপ ধ্যান বজায় থাকে, তাহলে সেটিকেও ভগবান-প্রাপ্তি বলা হবে।

[১৫]

তোমার সেই কাজই করা উচিত যাতে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়, চাতক পাখির মতো এই ধারণা পোষণ করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত—যদি প্রাণ যায় তো যাক তবুও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধন-ভজন-ধ্যান এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করা উচিত নয়। ভজন-ধ্যান এবং সৎসঙ্গের ত্রুটি কেন হয় ? পরে অনুশোচনা করে কিছু হবে না। তোমার কাছে এমন কী শক্তি আছে যাতে মৃত্যুর হাত থেকে তুমি রেহাই পেতে পারো ? অতএব চাতক পাখির ন্যায় প্রাণের পরোয়া না করে 'পণ' অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার পালন করা উচিত।

পপীহা প্রণ কবহুঁ ন তজৈ, তজৈ তো তন বেকাজ।
তন ছুটৈ তো কছু নহীঁ, প্রণ ছুটৈ তো লাজ॥

যে কাজের জন্য তুমি সংসারে এসেছো, বিচারপূর্বক সেই কাজ তোমার কখনোই ভোলা উচিত নয়। ভগবানের জপ, ধ্যান এবং সৎসঙ্গের জন্য মনে খুবই উৎসাহ থাকা দরকার। সৎসঙ্গ, ভজন এবং ধ্যান বৈরাগ্য ব্যতীত হয় না। সংসারের ভোগের বৈরাগ্য ব্যতীত ঈশ্বরে পূর্ণ প্রেম হতে

পারে না। সংসারের সুখ তথা টাকাপয়সা কোন্ কাজে আসবে ? সব কিছুই এখানে রয়ে যাবে। যদি ভগবানের নাম-জপই না হল তো সংসারের সুখ কোন্ কাজের ?

সুখকে মাথে সিল পড়ো, (জো) নাম হৃদয়সে জায়।
বলিহারি বা দুঃখকী (জো) পল পল রাম রটায়॥

শরীর ও টাকাপয়সা এখানেই রয়ে যাবে, মৃত্যুর পর এ তোমার কোনো কাজে আসবে না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই সবের পরে তোমার অধিকার আছে, ততক্ষণ তুমি ইচ্ছানুসারে এর থেকে কাজ নিয়ে নাও। ঈশ্বরের প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থই প্রধান—এই বুঝে নিয়ে ধনকে ধুলোর সমান জেনে সেই আসল আনন্দে খুব জোরের সঙ্গে লেগে পড়া উচিত যাতে শীঘ্রই ভগবানকে পাওয়া যায়।

[১৬]

যখন তোমার দেহত্যাগ হবে, তখন এই শরীর, টাকাকড়ি কোন্ কাজে আসবে ? সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অধিকারে কিছু করার আছে, তাঁর জন্য দেরী কর কেন ? সময় বয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বস্তুর নিশ্চিত ত্যাগ করতে হবে। পরে আপশোষ করলে কাজ হবে না। এরূপ জেনে মানুষের সেই পরমানন্দ স্বরূপে মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত। 'আমি' এবং 'আমার' ভাবকে শীঘ্র ত্যাগ করা উচিত। নাহলে খুবই ক্ষতি হবে—

মৈঁ জানা মৈঁ ঔর থা, মৈঁ তো ভয়া অব সোয়।
মৈ তৈঁ দোউ মিট গঈ, রহী কহন কী দোয়॥

অর্থাৎ আমি জেনেছি যে আমি ভিন্ন ব্যক্তি কিন্তু বাস্তবে আমি তার সঙ্গে মিশে আছি। শুধু বলার জন্য 'আমি', 'তুমি' ভাব রয়েছে, বাস্তবে ভেদাভেদ মুছে গেছে।

এরূপ উদ্ভাসিত হওয়ার উপায় সর্বদা করা উচিত। অন্য দ্বিতীয় কোনো কাজে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা অতিশয় মূর্খতা। এর কারণ হল 'অবিশ্বাস'। এইজন্য নাম-জপের সাথে সাথে এরূপ ধারণা থাকা উচিত

যে আর যা কিছু আছে, সে সবই 'ওঁ' স্বরূপ। 'আমি' কিছুই নয়। যখন 'আমি' বলে কোনো অস্তিত্ব নেই তখন 'আমার' বলেও কখনো কিছু হতে পারে না। একমাত্র 'ওঁ' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই বর্তমান। সর্বব্যাপী শান্তানন্দ, পূর্ণানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নেই। নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থের প্রতিও মনোযোগ থাকা উচিত। ধ্যান এমন হওয়া উচিত যে যাতে মন সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়। আনন্দঘনকে নিজের স্বরূপ জেনে, আনন্দঘনতেই নিজেকে অবস্থিত মনে করে, সারা জগৎ নিজেরই এক অংশ কল্পনা করে আনন্দঘনতে স্থিত হলে 'আমি' আপনিই শান্ত হয়ে যায়। দৃশ্যের অভাব হলে পরে 'আমিত্বে'র অভাব আপনাআপনিই হতে পারে।

চাতকের কথা জানতে চেয়েছো। সে ব্যাপারে শুনেছি চাতকের প্রাণ চলে গেলেও সে বর্ষার জল ব্যতীত পৃথিবীর জমা জল কখনো পান করে না।

চাতক সুতহিঁ পঢ়াবহী আননীর মত লেয়।
মম কুল যহি স্বভাব হৈ, স্বাতি বূঁদ চিত দেয়॥

অর্থাৎ চাতক পাখি নিজের বাচ্চাকে এই শিক্ষাই দেয় যে অন্য কোনো জল গ্রহণ করবে না। আমাদের (কুলের) ধর্মই হচ্ছে শুধুমাত্র বর্ষার জলের উপর নির্ভর করে থাকা।

এইরূপে ভগবানে প্রেম করা উচিত। শুনেছি ভগবানের কাছে (মানুষ) এই প্রতিজ্ঞা করেছে যে 'আমি আপনার স্মরণ করবো'। এইজন্য যে কাজে তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে সেই কাজ কখনোই ভোলা উচিত নয়। ভগবানে প্রেম হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো—ভগবানের নাম-জপ এবং ধ্যানই হল সবথেকে প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবানের নাম-জপ এবং স্মরণ অধিক হওয়ার উপায় হচ্ছে 'সৎসঙ্গ'। সৎসঙ্গ করলে এবং ভগবানের গুণাবলী চর্চা করলে, শ্রদ্ধা জন্মে এবং তার ফলে ভগবানের স্মরণ অধিক পরিমাণে হলে পাপ নাশ হয়ে পূর্ণ প্রেম লাভ হয়—এরূপ বলা হয়ে থাকে। এইজন্য মনকে সংসারের সব ভোগ থেকে জোর করে টেনে

কেবল পরমাত্মার নাম-জপ এবং ধ্যান যাতে অধিক সংলগ্ন হয় সেই উপায় করা উচিত। মিথ্যা 'সুখ' তোমার কোন্ কাজে আসবে।

সুখকে মাথে সিল পড়ো, (জো) নাম হৃদয়সে জায়।
বলিহারী বা দুঃখকী, (জো) পল পল নাম রটায় ॥

শারীরিক সুখ ভোগ ও টাকা পয়সা এখানেই রয়ে যাবে, অনিত্য বস্তুর জন্য নিত্য বস্তু যে ত্যাগ করে তার মতো মূর্খ আর কে আছে ? সংসারের বস্তুসমূহ, টাকা পয়সা এবং এই শরীর এমন কাজে লাগানো উচিত, যাতে সচ্চিদানন্দ ভগবানকে শীঘ্র পাওয়া যায়।

সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছো—ভগবানে প্রেম হলে এবং সংসারে ভোগের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য হলেই তা সম্ভব। প্রেমপূর্বক ভগবানের নাম জপ হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো—এ বিষয়ে আমি আর কী বলব !

তবুও অনুমানে কিছু লেখা যাক। এ বিষয়ে ভগবানের গুণকীর্তন এবং প্রভাবের কথা পড়তে শুনতে এবং মনন করতে করতে তথা ভগবানের স্বরূপের চিন্তন করতে করতে প্রসন্ন চিত্তে, আনন্দমগ্ন হয়ে (বারম্বার) তাঁকে স্মরণ করা উচিত। যেমন গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৭৭ নং শ্লোকে সঞ্জয় বলেছেন।[১] জপ এবং ধ্যানে ভুল না হয় এমন উপায় করা উচিত। এরূপ ইচ্ছা হওয়াও খুবই উত্তম। এরূপ ইচ্ছা হলে আর বিশেষ বিলম্ব হয় না। কারণ খাঁটি (প্রকৃত) ইচ্ছুক মানুষ প্রযত্নপূর্বক তৎপর হয়ে যায়। যাঁর নিরন্তর ভজন ধ্যান করার ইচ্ছা হবে তাঁর ভজন ধ্যান ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগবে না। এরূপ হলে (বাহ্যিক) স্ফুরণও কম হয়ে যায়। যদি জপ করার সময় স্ফুরণ হয় তো হোক, তবুও নিষ্কামভাবে অনবরত জপ করে

---

[১]তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥

—হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অদ্ভুদ রূপ বারংবার স্মরণ করে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষিত হচ্ছি।

যাওয়া উচিত। জপের আধিক্যে যখন প্রেমপূর্বক স্বত ধ্যান হবে, তখন স্ফুরণও নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যাবে। যদি যৎসামান্য স্ফুরণ হয়ও তবে তা বেশি সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। যতদিন না সংসারের প্রতি প্রেম-আসক্তি এবং তার স্বত্তার প্রভাবের নাশ হয় ততক্ষণ স্ফুরণ হয় তবে এতে কিছু ক্ষতি নেই। ভগবানের চিন্তা করাই হল ভগবানে অধিক প্রেম হওয়ার উপায়, যে প্রকারেই হোক তাঁর চিন্তা হওয়া উচিত। যদি 'চিন্তন" সম্ভব না হয়, নামজপ তো অবশ্যই হওয়া উচিত। যাতে 'প্রেম' হবে তার চিন্তাই বেশি হবে।

ক্রোধের কথা জানা গেল। সংসারের 'সত্তা' এবং তাতে ভালোবাসার অভাব হলে ক্রোধ সমূলে নাশ হয়ে যায়। উপরন্তু মৃত্যুকে মনে রাখলে, যা কিছু বাসনা ভাসমান, সেগুলিকে মৃত্যুর মুখে অনুভব করলে, কালান্তরে অভাব বুঝলে, ভগবানের লীলা মাত্র জানলে এবং পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখলে 'ক্রোধ' হয় না। যা কিছুই ঘটুক তাতেই আনন্দিত হওয়া উচিত। যা কিছু হয় সব পরমেশ্বরের আদেশে হয়। যা কিছু আছে সবই সেই পরমেশ্বরের। সমস্তই তাঁর লীলামাত্র জেনে আনন্দ করা উচিত। তাঁর বিরুদ্ধে ইচ্ছার দরকার কী ? 'ইচ্ছাই' ক্রোধের মূল।

[১৭]

নাম-জপের নিরন্তর অভ্যাস হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা হলে তবেই ভালোরকম ধ্যান হওয়া সম্ভব। ভগবৎ-নাম সর্বদা জপ হওয়ার জন্য সৎসঙ্গ করা এবং শাস্ত্র পড়ার অভ্যাসের চেষ্টা করা উচিত। তীব্ররূপে সর্বদা ভগবানের নাম-জপ হতে থাকলে, ভগবানে প্রেম উৎপন্ন হয়ে আপনাআপনিই প্রেমের সঙ্গে (ভালোবাসার সহিত) জপ হতে থাকে। তারপর ভগবানের কৃপা ও তাঁর প্রভাবও আপনা হতেই বোধ হয়। ভগবানের তো পূর্ণরূপে কৃপা আছেই, উপরন্তু তিনি যোগ্য পাত্রে উদ্ভাসিত হন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হন। যেমন সূর্যের প্রকাশ সব জায়গায় পরিপূর্ণ হলেও দর্পণে প্রত্যক্ষবৎ ভাষিত হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাব অল্প জানা গেলেও, সংসারে যা কিছু হয় সাধক সবই ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন এবং তখন তিনি নিজের ইচ্ছাকে

ত্যাগ করে সমস্ত কিছুর সাক্ষী হয়ে আনন্দমগ্ন থাকেন। ভগবানে এতটাই প্রেম (ভালোবাসা) বৃদ্ধি হয় যে তিনি ভগবানকে ছাড়তেই পারেন না। পুরুষার্থ অধিক হলেই ভজন অধিক হয়। ভজন অধিক হলেই ভগবানের প্রভাব জানা যায়। ভগবানের নামের জপ অধিক পরিমাণে করার চেষ্টা নিজের পুরুষার্থের অধীন।

তুমি লিখেছো যে ভগবানের প্রেম (ভালোবাসা) জানালে তবেই জানা যায়। বাস্তবে ভগবানের ভজন-ধ্যানই ভগবানকে জানিয়ে দেয়। ভজন-ধ্যান দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হলে প্রেম উৎপন্ন হয়। তুমি লিখেছো যে তোমার অনেক সময় বয়ে গেছে, এখন শীঘ্র উপায় হওয়া চাই। এরূপ ইচ্ছা হওয়াও অতি উত্তম। তুমি লিখেছো যে, এরূপ সুযোগ পেয়েও যদি উদ্ধার না হবে তো আর কবে হবে ? —সে তো ঠিকই। যে এইভাবে সময়ের প্রভাবকে জেনেছে, তার সময় ভজন-ধ্যানেই কেটে যাওয়া উচিত। সময়ের মূল্য জানার পরে নিজের উদ্ধার হওয়া কী এমন বড় কথা ? বরং এর দ্বারা অন্যান্য অনেক প্রাণীরও উদ্ধার হতে পারে। নিজের উদ্ধার যদি নাও হয় তবুও প্রেমের সঙ্গে ভগবৎচিন্তন হওয়া চাই। যদি তোমার অতি শীঘ্র উদ্ধারের ইচ্ছা বজায় থাকে তো অতি উত্তম কথা। তবে আর কোনো চিন্তা নেই। তুমি লিখেছো যে এখন আর আনন্দ হয় না। এর উত্তরে জানানো হচ্ছে যে, আনন্দ না হলেও কেবলমাত্র প্রেমের সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে ভগবানের চিন্তন হওয়া চাই। আনন্দের ইচ্ছা তো তুচ্ছ। 'ধ্যান' কি শুধু আনন্দ লাভের জন্য করা হয় ? ভজন ও ধ্যান তো ভগবানের জন্য করা হয়ে থাকে। আমি তোমাকে ভগবানের 'ভক্ত' লিখেছি—সে ঠিকই লিখেছি, কিছু কথা জানারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পূর্ণভক্ত হলে পরে 'আমি' ও 'আমার' অভাব হয়ে যায়।

দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া, না হওয়া—সবই যোগাযোগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেও ভালোবাসা থাকা চাই। সে তো তোমার আছেই। কিন্তু নিষ্কাম প্রেম যত বাড়ে ততই উত্তম।

তুমি লিখেছ যে, এবারে যেরূপ ধ্যান হয়েছে, সেরূপ সামান্যও যদি

ধারণা হয়ে যায় তো ধন্য হয়ে যাই (সফল হয়ে যাই)। যদি কৃতকার্য নাও হও তথাপি প্রেমের সঙ্গে নিরন্তর ধ্যান হওয়া চাই। নিষ্কামরূপে ভগবানের নিরন্তর ভজনকারী পুরুষগণের দর্শনে হাজার হাজার পুরুষ ধন্য হয়ে যায়—যদি তারা শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে সেই ভক্তকে দর্শন করে এবং তাঁর প্রভাবকে বুঝতে পারে।

এই সংসার মিথ্যা। ভগবানের লীলামাত্র। একে সত্যি জেনে আসক্ত হয়ে 'বাসনা' উৎপন্ন হলে মানুষের মধ্যে বহু প্রকার দোষ এসে যায়। এইজন্য ভগবানের শরণ নেওয়াই উত্তম। সংসারে যা কিছু হয় সবই ভগবানের আজ্ঞাতেই হয়। ঈশ্বরের শরণে (আশ্রয়ে) যাওয়ার পরে তাঁর আজ্ঞা কেন মানবে না ? যা কিছু ঘটে সবই তাঁর কল্পিত—মিথ্যা এবং লীলামাত্র। যাই হোক না কেন আমার অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধুমাত্র সাক্ষীভাবে থাকা উচিত। যদি এরূপ (অর্থাৎ তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার পরেও) হলেও দুঃখ হয়, তাহলে বুঝতে হবে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শরণ নেওয়া হয়নি। ভগবান যা কিছু করেন তাকে আনন্দের সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত। যদি মনে একটুও দুঃখ আসে তাহলে বোঝা উচিত যে প্রভুর বিধানে বিশ্বাসই নেই। সবকিছুই তো প্রভুর। তিনি নিজের দ্রব্যের যেমন খুশি ব্যবহার করুন না কেন আমাদের কী আসে যায় ? এর দ্বারা মনকে ময়লা করলে (অর্থাৎ দুঃখিত হলে) প্রভু আমাদের মূর্খ মনে করেন। কারণ সে অনিত্য বস্তুকে সত্য এবং নিজের মনে করেছে, সংসারের মিথ্যা বস্তুকে আশ্রয় করেছে। সেই মূর্খ সংসারের দাস। যে সংসারের ইচ্ছা পোষণ করে সেই সংসারের দাস। সাংসারিক বস্তুসমূহের ইচ্ছা (কামনা) যে পোষণ করে সেই সংসারে জন্ম নেয় (পুনর্জন্ম গ্রহণ করে)। এইরূপ পুরুষ ভগবানের অন্তঃকরণ এবং মনের প্রভু (কর্তা) হতে পারেন না। যে ভগবানের প্রেমী (প্রেমিক পুরুষ), সেই ভগবানের সর্বস্বের মালিক হতে পারে। সংসার-ভোগের প্রেমী তো সংসারের এক পোকামাত্র। সংসারের ভোগকে মিথ্যা এবং তাঁর লীলামাত্র জেনে নিজের মন থেকে সেগুলিকে ত্যাগ করা উচিত। যে ব্যক্তি ত্রৈলোক্য রাজ্যকে অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-

পাতালকে তুচ্ছ জেনে কেবলমাত্র নারায়ণেরই প্রেমী, সেই ব্যক্তিই ধন্যবাদের পাত্র। ভগবান সর্বদা তার কাছেই থাকেন।

[১৮]

বৈরাগ্যের উৎকণ্ঠাকে সর্বদা জাগিয়ে রাখার সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছ। উত্তর—সাধন-ভজন-ধ্যান এবং সৎসঙ্গের তীব্র অভ্যাসই এর উপায় বলে জানা যায়। সংসারে দুঃখ এবং দোষ-বুদ্ধি হলেও বৈরাগ্য হয়, কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তির অভাব এবং ঈশ্বরে ভাব বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া সংসার হতে পূর্ণ বৈরাগ্য হয় না।

শ্রীসচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে, তাঁতে প্রেমের সঙ্গে স্থিতি বজায় থাকে তার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো। প্রেম ও প্রকৃষ্ট ভাবের সঙ্গে ভজন এবং সৎসঙ্গের তীব্র অভ্যাসের প্রচেষ্টাই হল একমাত্র উপায়—এটাই আমি বুঝি। অতএব নিরন্তর অভ্যাস হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা চাই। তবেই 'প্রেম' স্বত উৎসারিত হবে।

ভালোবাসার সঙ্গে নিরন্তর অভ্যাস করার ব্যাপারে প্রকৃষ্ট কোনো উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। আমার মতে আলস্য ত্যাগ করে শরীর মৃত্তিকার তুল্য জেনে বিশ্বাসপূর্বক দেহমন একাত্ম করে ধ্যান ও জপের তীব্র চেষ্টা করতে হবে। ধ্যানে যদি (বাহ্যিক) স্ফুরণ হয় তাহলে যা কিছু চিন্তায় উদ্ভাসিত হয় তাকে কেবলমাত্র কল্পিত এবং মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় মনে করা উচিত। কিছুই নেই—একথা মনে করে উদ্ভাসিত দৃশ্যের কথা ভুলে যাওয়া উচিত এবং অনিত্য জেনে সে সব ত্যাগ করা উচিত। কেবলমাত্র সেই অচিন্ত্যে অ-চিন্ত (চিন্তামুক্ত) হয়ে, সংকল্প ত্যাগ করে, এমনকী সেই সংকল্প ত্যাগের জ্ঞানকেও ভুলে যাওয়া উচিত। কেবল সচ্চিদানন্দঘন ছাড়া আর কিছুই নেই—এরূপ ভাবে ভাবিত হয়ে যাওয়া উচিত। যদি বৈরাগ্য হয়, তাহলে বিনা চেষ্টাতেই সাধনা সর্বপ্রকারে ঠিকঠাক হয়ে থাকে। কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে বিনা বৈরাগ্যে বিশেষ সময় পর্যন্ত টিকে থাকা কঠিন। সংসার এবং দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং কালের মুখে অবস্থিত—এভাবে দেখলে এবং সময়কে অমূল্য মনে করে ভজন করলে

ভজন-ধ্যান অধিক হয়ে অন্তঃকরণ নির্মল হয়ে যায়, আর যখন অন্তঃকরণের পাপ এবং দোষ নষ্ট হয়ে যায় তখন বৈরাগ্য অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

অমুক ব্যক্তিকে লেখা পত্রে ধ্যানের বিষয়ে খোলাখুলি জানাতে চেয়েছো যার সারাংশ নিম্নপ্রকার—

(১) সমস্ত স্থানেই এক সচ্চিদানন্দঘনই (সৎ+চিৎ+আনন্দঘন) সমরূপে (বর্তমান) স্থিত রয়েছেন। যা কিছু দৃশ্য বস্তু উদ্ভাসিত হচ্ছে বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয় এবং যা কিছু উদ্ভাসিত হয় সেই সব শরীর এবং সংসার শুধু কল্পনামাত্র। বাস্তবে একমাত্র পরমেশ্বরই সমভাবে সর্বত্র পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। যদি আর অন্য কিছুও উদ্ভাসিত হয়, তো তাকে (সত্যি বলে) মানবে না। শুধুমাত্র আনন্দঘনই যেন অবশিষ্ট থাকে এবং সেই আনন্দঘনের উপস্থিতির ভাবও সেই আনন্দঘনতেই স্থিত (বর্তমান)। আনন্দঘনের জ্ঞাতা, আনন্দঘন স্বয়ং ছাড়া আলাদা কেউ নয়।

(২) সর্বব্যাপক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হয়ে সেই সর্বব্যাপী স্বরূপের অন্তর্গত এই সংসারকে সংকল্পের আধার মনে করে সর্বব্যাপী দ্রষ্টা হয়ে, সর্বব্যাপী জ্ঞাননেত্রদ্বারা সংসারকে কল্পিত এবং পরমাত্মাকে 'ভিন্ন'রূপে দেখবে। গীতার ১৪ অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকানুসারে সর্বব্যাপকের অন্তর্গত কল্পিত এই শরীর দ্বারা সর্বদা ভজন হয়ে চলেছে।

সর্বব্যাপক ভগবৎস্বরূপে স্থিত হয়ে এই শরীরসহ ভজনাকে সমষ্টি বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ সর্বব্যাপী জ্ঞাননেত্রদ্বারা দেখবে।

(৩) সর্বব্যাপী অনন্ত-বোধ স্বরূপের দ্রষ্টা হয়ে, এই মনুষ্য শরীরে, যাতে পূর্বে আপন স্থিতি ছিল, সেই শরীরকে ওঁকার-রূপ আকার মনে করে, ওঁকারের চিন্তা করতে থাকবে। সেই ওঁকাররূপ শরীরকে নিজের সংকল্পের আধার মাত্র মনে করবে। বাস্তবে সেই সচ্চিদানন্দঘন ভিন্ন আর

কিছুই নেই। এইভাবে নিজের দৃঢ় বিশ্বাসে স্থিত থাকবে। এরূপ দৃঢ় অভ্যাস হলে ক্রমে এক সচ্চিদানন্দঘন ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কল্পিত শরীরের যে ধারণা পরে তা থাকে না। 'ওঁকারে'র অর্থ 'সচ্চিদানন্দঘন' (সৎ-চিৎ-আনন্দের মূর্তরূপ) এবং সেটাই শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়ে যায়। একবার 'ওঁকার' চিন্তা পদ্ধতি জেনে গেলে আর ত্যাগ করা উচিত নয়। একান্তে (নির্জনে) এই প্রকার সাধন করা উচিত।

(৪) সচ্চিদানন্দঘনের ভাব (সত্তা), শরীর (দেহ), সংসার অথবা যা কিছু চিন্তায় আসে সে সব জিনিসের অত্যন্ত অভাব জানবে এবং যা কিছু দৃশ্যমান বাস্তবে তার কিছুই নেই—এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় (বিশ্বাস) হওয়া চাই। এইরূপ নিশ্চয় (দৃঢ় প্রত্যয়) হলে এক সচ্চিদানন্দঘন ছাড়া সব কিছুরই অ-ভাব হয়ে পরমানন্দময় সেই সচ্চিদানন্দই সর্বত্র বিরাজ করেন। ইহাই হল পরমপদ।

উপরিল্লিখিত বক্তব্যটি অমুক ব্যক্তিকে লেখা পত্রের সারাংশ। ধ্যানের বিষয় ঠিকঠাক বোধগম্য হওয়ার জন্য সেখানে আরও বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

সময়কে অমূল্য জানা উচিত। এই বোধযুক্ত ব্যক্তি একটি পলও মিথ্যা কাজে নষ্ট করে না। যে মিথ্যা এবং বৃথা কাজে সময়কে অতিবাহিত করে সে সময়ের মূল্যকে জানে না। (যখন) অল্প মূল্যের বস্তুকেও কেউ নষ্ট করতে চায় না, তবে সেই অমূল্য বস্তুকে নষ্ট করা কী করে সম্ভবপর ?

যে ধ্যান-কালে আনন্দের লালসা থাকে, সেই ধ্যান নিম্নশ্রেণীর। এরূপ ইচ্ছাধারী ব্যক্তিগণ তো অল্প সময়ের জন্য সুখ বা আনন্দের জন্য ধ্যান করেন। ভগবানের চিন্তন এক অমূল্য বস্তু। এর মর্ম যে জেনেছে সে তো নিরন্তর ধ্যানস্থ থাকার চেষ্টা করবে, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা রাখবে না। স্বল্পকাল স্থায়ী আনন্দ যদি নাও হয় তাতে গরজ নেই, কিন্তু নিরন্তর ভগবানের চিন্তা হওয়া চাই।

[১৯]

সময় বয়ে যাচ্ছে। যা কিছু করতে হবে তা অতি শীঘ্রই করে নাও। তুমি কী কারণে বিলম্ব করছো ? তোমার কীসের প্রয়োজন ? কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে ? এক মুহূর্তের জন্যও তোমার নারায়ণকে ভোলা উচিত নয়। অন্তিমে এক নারায়ণ ছাড়া কেউ তোমার হবে না। এই অসার সংসারে কিছুমাত্র সার নেই। সবই মায়ার খেলা। যদি বুদ্ধিমান হও তো জেনে-বুঝে এর (মায়ার) জালে ফেঁসো না। কিন্তু যে বুঝতে পারে না সে এই মায়ারূপী ঠগিনির মোহ জালে অর্থাৎ ভোগরূপী কাঞ্চন-কামিনীর ফাঁদে পড়ে ফেঁসে যায়।

[২০]

'যন্ত্রণা'র জন্য অনেক সময় পর্যন্ত 'শুয়ে' থাকতে হয় এবং তাতে আলস্য অর্থাৎ নিদ্রা বেশি আসে, এতে সাধনে অনেক ভুল হয় লিখেছো। সে তো ঠিকই। এই পরিস্থিতিতে গীতার শ্লোকের অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা উচিত। যদি অধিক সময় অভ্যাস করার জন্য নিদ্রা আসে তাহলে ধ্যান-সহিত ভজনরত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়া উচিত। ভগবানকে সর্বদা স্মরণে রাখার কথা অনেক সময়ই ভুল হয়ে যায়—তো সেটা দূর করার উপায় হল তীব্র অভ্যাসের চেষ্টা করা।

ভগবানে প্রেমবৃদ্ধির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছো। এই বিষয়ে আগেই লিখেছি। ভগবানের গুণানুবাদ পড়লে, শুনলে, বললে তথা তাঁর লক্ষণসমূহ, অন্তরের ভাব এবং প্রভাবের দিকে মন দিলে ভগবানে অধিক প্রেম হয় এবং তীব্র ভজন এবং সৎসঙ্গ করলে তা ফলপ্রসূ হয়। যে বস্তুর জন্য তীব্র ইচ্ছা হয় তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই বহুভাবে চেষ্টা (প্রযত্ন) করা হয়ে থাকে। যাঁর টাকা পয়সার প্রয়োজন সে তা পাওয়ার জন্য দেহে-মনে অনেক প্রচেষ্টা করে থাকে এবং মনের মধ্যে সর্বদা এই চিন্তা জাগ্রত থাকে যে কী উপায়ে টাকাকড়ি আসতে পারে ? টাকা পয়সা অর্জনের জন্য সে নিজের বুদ্ধি, মন, সব কিছু অর্পণ করে দেয়। যার টাকার বিশেষ ইচ্ছা হয়, সে যেমন টাকা পয়সার চিন্তাই অধিক করে ঠিক সেইরূপ যাঁর

ভগবৎমিলনের ইচ্ছা হয় তাঁর মনবুদ্ধিও ভগবানেই অর্পিত হয়ে যায়। তাঁর (মনের) তীব্র ইচ্ছা ভগবৎমিলনের উপায়, ভজন ও সৎসঙ্গ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তীব্র ইচ্ছা মনে জাগলে কী যে দশা হয়, সেটা টাকাকড়ির উদাহরণ থেকেই জানা যায়। যে বস্তুর জন্য তীব্র ইচ্ছা হয়, তার জন্য উপায় এবং চেষ্টাও তীব্র হয়ে থাকে।

মনে করুন, আপনার কোনো প্রিয়জনের খুবই অসুখ করেছে। বৈদ্য বলছেন যে অমুক ওষুধ খেলে এ বাঁচতে পারে। ওই সময়ে সেই ওষুধের জন্য কী অধিক পরিমাণে চেষ্টা করা হয় ? এমনই চেষ্টা ভজন ও সৎসঙ্গের জন্য হওয়া চাই। ইচ্ছার তীব্রতা বৃদ্ধি হলেই চেষ্টার তীব্রতা বৃদ্ধি হয় এবং তীব্র চেষ্টা হলেই ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হয়। মিথ্যা সাংসারিক বস্তুতো কখনো কখনো বা চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায়, রোগীর লাভ হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে। কিন্তু ভজন ও সৎসঙ্গের জন্য চেষ্টা করলে তো অবশ্যই সফলতা প্রাপ্তি হয়। ভজন ও সৎসঙ্গরূপী ঔষধ সেবন করলে জন্মমৃত্যুরূপী কঠিন ভবরোগ অবশ্যই শেষ হয়ে যায়। সত্যের জন্য চেষ্টা কখনো ব্যর্থ হয় না।

'জপে' অনেক ভুল হয় লিখেছো। এই বিষয়ে আগেও তোমাকে লিখেছিলাম। 'জপ' অধিক অভ্যাসের দ্বারাই জপের ভুল দূর হতে পারে এবং ভুল হলেও প্রসন্নমনে 'জপ' করার অভ্যাস তৈরি করলে ভবিষ্যতে প্রীতি সহকারে জপ হওয়া সম্ভব (প্রেমপূর্বক জপ সম্ভব)। 'জপ' যখন নিরন্তর হয়, তখন সেটি ভালোবাসার সঙ্গেই হয় (প্রেমপূর্বকই হয়)। বৈরাগ্য হলে 'ধ্যান সহিত জপ' বিনা চেষ্টাতেই নিরন্তর হতে থাকে। 'ভগবানের স্মরণ সর্বদা থাকা প্রয়োজন'—এরূপ ইচ্ছাই নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তনের হেতু। যদি জপ করার সময় সংসারের স্ফুরণ হয়, তাহলে জোরকরে ভগবৎ বিষয়ের স্ফুরণ উৎপন্ন হওয়ার অভ্যাস করা উচিত। এরূপ অভ্যাস করলে জপের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের বৃদ্ধি এবং সাংসারিক বাসনার নাশ হতে পারে। যদি 'স্বত্তা' এবং 'আসক্তি'রহিত স্ফুরণ হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। সাংসারিক স্বত্তা এবং আসক্তির নাশ হওয়ার

উপায় জপ এবং সৎসঙ্গ। এটির জন্য অভ্যাসের খুব বেশি আবশ্যকতা আছে।

ভগবানের নামের স্মরণ সর্বদা হওয়া উচিত। তারপর তো অভ্যাস বাড়ালেই সংসারে বৈরাগ্য এবং ভগবানের স্বরূপে স্থিতি হওয়াও সম্ভব। পরমাত্মার তো সবার উপরই পূর্ণ কৃপা আছে। যার এরূপ নিশ্চয় হয়ে গেছে সে তো ভগবানের কৃপাপাত্র। সে শীঘ্রই ভগবান লাভ করে, কারণ 'তিনি' বিনা তার স্বস্তি হয় না। সংসার এবং শরীরকে মিথ্যা নশ্বর এবং এক পরমাত্মাকে আনন্দে পরিপূর্ণ দেখলে বৈরাগ্য হতে পারে। সংসারে বিতৃষ্ণা (ঘৃণা) জন্মালে সংসারের চিন্তা আপনাআপনিই কম হতে পারে।

তাঁর স্বরূপের চিন্তন, নামের জপ এবং সৎসঙ্গই প্রেম হওয়ার উপায়। যত অধিক চেষ্টা হবে, তত বেশি 'জপ' হবে। যিনি ভগবানকে সর্বত্র অন্তর্যামী, দয়াসিন্ধু এবং বিনা কারণে শুভকারক বলে জানেন, তিনি কখনো কোনো বস্তুর জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন না। যদি তিনি কখনো প্রার্থনা করেন তাহলে এই প্রার্থনা করবেন যাতে নিরন্তর ভাবের সঙ্গে ঈশ্বরের চিন্তন হয়। যদি সর্বদা 'নাম' স্মরণে রাখার অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে ধ্যানের স্থিতিও (উপযুক্ত অবস্থাও) হতে পারে। ভগবানকে স্মরণে রেখে যাতে কাজ করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সাংসারিক কার্য অপেক্ষা ভজন-ধ্যানকে অনেক বেশি উত্তম ও বহুমূল্য জানা উচিত। সংসারের কাজে যতই ক্ষতি হোক না কেন, সেই অনিত্য কাজের জন্য ভজন-ধ্যান বাদ দেওয়া উচিত নয়—এরূপ পাকা ধারণা হয়ে গেলে সংসারের কাজ করতে করতেও ভজন সম্ভব হয়।

বিবাহ পর্বের সময় কী প্রকারে কী করা উচিত—এই সম্বন্ধে আগেও লিখেছি। বিবাহাদি সাংসারিক কাজ নদীর প্রবাহের মতো। যে পুরুষ ভগবৎ-চরণরূপী নৌকায়, নামরূপী রশিকে (দড়িকে) আঁকড়ে ধরে ধ্যানদ্বারা আরূঢ় হয়ে থাকে, তিনিই রক্ষা পান। আর যে নদীপ্রবাহের মতো বয়ে যায়, তার বড় খারাপ দশা হয়।

ভজন-সৎসঙ্গ অধিক করা হলে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে 'ধারণা' হতে বিলম্ব হয় না। সাংসারিক কামনা যাতে না থাকতে পারে সেই চেষ্টা তো তুমি করছই কিন্তু এর জন্য আরও বেশি চেষ্টা এবং পুরুষার্থের প্রয়োজন। এই কার্যে অভ্যাসই প্রধান কথা। 'অভ্যাস' কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হতে স্বতন্ত্র। তুমি সংসারে এসে কী করলে ? —এইভাবে যদি সময় চলে যায় তাহলে আসল কাজ শীঘ্র কীরূপে সম্পন্ন হবে ? সময়কে অমূল্য কাজেই ব্যয় করা উচিত। পরে সংসার, টাকা পয়সা তথা ভোগ সামগ্রী তোমার কোন্ কাজে আসবে ? সেই বস্তুই নিজের বস্তু যা ভগবানে প্রেম বৃদ্ধি করায়। বাকি সবই মাটির সমান। 'সোনা' আর 'পাথরে'র পাহাড়ে কী পার্থক্য ?—কোনোটাই সঙ্গে যাওয়ার নয়। এই শরীরও মাটিতে মিশে যাবে। এইরূপ জেনে এই শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আসল কাজটি নিষ্পন্ন করা উচিত অর্থাৎ ভগবৎ কার্যে ব্যবহার করা উচিত। ভগবানের ভজন-ধ্যান বিনা একটি ক্ষণও বৃথা কেন যাবে ? কোনো কারণেই ভজন-ধ্যান বিনা একটি পলও কাটতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ সবকিছুই অনিত্য। অনিত্যের জন্য নিজের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়।

[২১]

কী প্রকারে ভগবানের ভজন করা উচিত—এ বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছো। এরজন্য সর্বদা ভগবানের নাম-জপ ও স্বরূপের ধ্যান করা উচিত। ভগবৎভক্তগণের সঙ্গ এবং শাস্ত্র-বিচার মাধ্যমেও ভজনা বৃদ্ধি হতে পারে। ভক্তদ্বারা বর্ণিত ঈশ্বরের গুণগান এবং তাঁর প্রভাব শ্রবণ করলেও অতি শীঘ্র প্রেম জাগতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের সঙ্গলাভ করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

তুমি লিখেছো যে তুমি (রামায়ণের) সুন্দরকাণ্ড রোজ পড়ে থাক, সে ভালো কথা, কিন্তু বালকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডও অধ্যয়ন করা উচিত। এর মধ্যেও ভগবৎপ্রেম এবং ভক্তির অনেক উত্তম (সুন্দর) বিষয় রয়েছে। সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তুমি লিখেছো যে তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করে থাকো—সে তো অতি

আনন্দের কথা ; পাঠ কিন্তু অর্থ বুঝে করা উচিত। অর্থ বুঝে এই সব গ্রন্থ পাঠ করলে ভগবানে মতি হতে পারে।

ধ্রুব যেভাবে ভগবানকে সগুণ মূর্তি রূপে ধ্যান করেছিল সেভাবেই ধ্যান করা উচিত।

প্রাতঃকালে সূর্য উদিত হওয়ার দেড়ঘন্টা আগে যদি ঘুম হতে ওঠা যায়, তাহলে অতি উত্তম। তা নাহলে কমপক্ষে এক ঘন্টা পূর্বে অতি অবশ্যই ওঠা উচিত এবং শৌচ স্নানাদি সেরে সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি নিত্য কর্ম করে নিয়ে পূর্বোক্ত গ্রন্থাদি পাঠ করা উচিত।

প্রায় ১০টার সময় মৌন হয়ে খাওয়া উচিত। ভোজন সামগ্রী একই সঙ্গে নিয়ে তা ঈশ্বরকে নিবেদনপূর্বক ভোজন করা উচিত। প্রত্যহ পঞ্চমহাযজ্ঞ করা উচিত, যদি ইহা করা সম্ভব না হয় তাহলে কমপক্ষে সন্ধ্যাগায়ত্রী জপ এবং বলিবৈশ্যদেব পূজা অবশ্যই করা উচিত।

সকাল এবং সন্ধ্যা উভয়কালেই সৎসঙ্গ করা উচিত। ভজন-ধ্যান এবং সৎসঙ্গের অধিক অভ্যাস হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত সংসার থেকে বৈরাগ্য হতে পারে। সংসারের সকল বস্তুকে বিনাশশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর মনে করে ভোগসমূহ ত্যাগ করা উচিত।

যদি সংসার সমুদ্র পার হতে চাও তাহলে সর্বদা ভগবৎনাম জপ করে যাওয়া উচিত। জপ করতে থাকলে ভগবানের স্বরূপের ধ্যান এবং তাঁতে অনন্য প্রেম আপনা-আপনিই হয়ে যায়। যদি তাহা নিষ্কামভাবে সাধিত হয়, তাহলে প্রেম জাগতে দেরী হওয়ার কোনো কারণই নেই। সেইজন্য নিষ্কামভাবে ভগবানের নাম জপ করাই হচ্ছে সমস্ত সাধনার আসল তত্ত্ব।

সময় বয়ে যাচ্ছে এবং এই অতিবাহিত সময় আর ফিরে আসবে না। কাজেই এই অমূল্য সময়ের একটি ক্ষণও ব্যর্থ করা উচিত নয় অর্থাৎ ভজন-ধ্যান ভুলে থাকা উচিত নয়।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি শত্রুরা আমাদের আসল সম্পত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে, সেইজন্য রামনামের বিউগল সব সময় বাজিয়ে যেতে হয়। বিউগল ধ্বনি হওয়াকালীন যেমন শত্রু (চোর-ডাকাত) কাছে ঘেঁষতে

পারে না তেমন রামনামরূপী বিউগল বাজাতে থাকলে কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুরাও কাছে ঘেঁষতে পারে না। কাজেই হুঁশ হওয়া উচিত।

বিন রখবারে বাবরে, চিড়িয়া খায়া খেত।
আধা পরধা উবরৈ, চেত সকে তো চেত॥
ইস ঔসর চেতা নেহিঁ, পশু যোঁ পালী দেহ।
রামনাম জানা নহি, অন্ত পড়ি মুখ খেহ॥

'হে অবুঝ প্রাণী ! পাহারাদারের অভাবে পাখিরা তোমার জীবনরূপী শস্য খেয়ে প্রায় শেষ করে দিল। সামান্য বাকি রয়েছে, এই অবসরে সামলে নাও। পশুর মতো নিজের শরীরের লালন-পালন করছো (অর্থাৎ আহার-নিদ্রা-মৈথুনে মগ্ন হয়ে আছো), যদি এখনও হুঁশ না হয়, নাম-জপের আশ্রয় না নাও তাহলে মনুষ্যজন্ম বৃথা হবে।'

এই দোহার তাৎপর্য সম্বন্ধে ভাবা উচিত। সৎসঙ্গ এবং ভগবৎনাম নিষ্কামভাবে প্রেমপূর্বক নিরন্তর জপ করে যাওয়া হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। এর ফলে ভগবানে প্রেম বিশ্বাস এবং ধ্যান অবশ্যই স্বত হয়ে যায়। আমাদের জীবনের আয়ু প্রায় শেষ হয়ে আসছে, কাজেই অজ্ঞান নিদ্রা থেকে অতি শীঘ্র জাগা আবশ্যক।

এই দেবদুর্লভ মনুষ্য শরীর পেয়ে এই জীবনকে ব্যর্থ না করে সার্থক করা উচিত। যে ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম পেয়েও ভগবৎভজনা না করে, শেষ সময়ে তার খুব অনুশোচনা হয়। কারণ যখন নিজের এই দেহ কোনো কাজে লাগবে না তখন অন্যান্য বস্তুর আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা।

[২২]

যে কাজের জন্য তুমি এই সংসারে মনুষ্য শরীর ধারণ করে এসেছো সেই কাজকে ভুলে যেও না। প্রথমত মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, তার উপর দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে জন্ম হওয়া, যজ্ঞোপবীত সংস্কার হওয়া, মাতা-পিতা-ভাই-স্ত্রী-সন্তান এবং ব্যবসায়িক কাজকর্ম মনের মতো হওয়া (মনের অনুকূল হওয়া) তো বড় ভাগ্যের কথা। প্রয়োজনানুসারে বাড়ি-ঘর-টাকা-পয়সাও তোমার আছে। এরূপ

পরিস্থিতিতেও যদি আত্মার উদ্ধারের (আত্ম-উদ্ধারের) উপায় না করা হয় তাহলে আর কবে করা হবে। এরূপ অনুকূল পরিস্থিতি সর্বদা টিকে থাকবে না। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হয় এবং শরীর আরোগ্য আছে তথা অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান, ততক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু উত্তম কাজ করতে হবে—সেসব খুব শীঘ্র করে নেওয়া উচিত, যাতে পরে অনুতাপ না করতে হয়। উপযুক্ত পদার্থ দু-চারটি যদি বাড়ে-কমে তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং কিছুতেই অসাবধান থাকা উচিত নয়। সংসার থেকে আর কী ধরনের অনুকূলতা তুমি চাও ? তোমার এমন কীসের অভাব আছে যা পেয়ে গেলে তুমি নিজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবে ?

এই সংসারে এক ভগবান ছাড়া আর কেউই তোমার নয়। মাতা-পিতা-ভাই-স্ত্রী-পুত্র-বাড়িঘর-টাকাপয়সা সবই ক্ষণভঙ্গুর, এই সবের সঙ্গ অল্প কিছুদিনের। এরমধ্যে কোনো কিছুই তোমার সঙ্গে যাবে না। অপরের কথা কী বলবো ? তোমার এই শরীরও এখানেই রয়ে যাবে। আমাদের সকলের সঙ্গে সংযোগও চিরদিন থাকবে না। শরীরের কোনো ভরসা নেই। অতএব আমি বেঁচে থাকাকালীন প্রত্যক্ষভাবে সাধন-ভজনের প্রেরণা লাভ করেও যদি নিজের উদ্ধারের জন্য তুমি সচেষ্ট না হও, তাহলে আমার দেহত্যাগের পর তোমার কল্যাণের সাধনায় আরও ঢিলেমি হওয়া তো কোনো বড় কথা নয়। তুমি বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক পদার্থের জন্য যত চেষ্টা করো সেরূপ যদি ভগবানকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করো তো খুব শীঘ্রই ভগবান প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। ভগবানের সমান প্রেমী, দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান দ্বিতীয় কেউ নেই। তবে কেন তুমি সেই প্রকৃত (খাঁটি) প্রেমিকের প্রেমলাভের জন্য সচেষ্ট হচ্ছো না ? দিনরাত্রি তুচ্ছ ধনের (বৈভবের) জন্য কেন লালায়িত হচ্ছো ? যখন এই শরীরই তোমার কাজে আসবে না, তখন টাকাপয়সার তো কথাই তুচ্ছ। শরীর নাশ হওয়ার পরে কেবলমাত্র এ পর্যন্ত কৃত ভজন-ধ্যান, সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র আদির অধ্যয়নই কাজে আসবে, আর কিছুই কাজে আসবে না। শরীরের বিনাশ অবশ্যই হবে। এটি অর্থাৎ এ দেহ বাঁচানোর কোনো উপায়ই নেই কিন্তু

শরীরের নাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না, এইজন্য যাতে শরীর নাশ হওয়ার পরেও আত্মা পরম সুখ লাভ করে—সে পরম আনন্দ যাতে পায় তার জন্য দিনরাত চেষ্টা করাই হল মনুষ্য জন্মের উত্তম ফল লাভ। এর দ্বারাই শ্রীসচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রাপ্তি ঘটে। মনুষ্য জন্ম আমরা লাভ করেছি এইজন্যই। অতএব ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা করা উচিত।

[২৩]

তোমার লেখা হতে জানতে পারলাম যে, বর্তমানে তোমার চিত্তের প্রবৃত্তিসকল বিশেষভাবে সংসারের চিন্তায় নিমগ্ন। আসক্তিসহ সাংসারিক কার্য বেশি করে করলে এমন হয়ে থাকে। এইজন্য সৎসঙ্গ করা উচিত। যখন তোমার নিজেরই সৎসঙ্গের অভিলাষ (ইচ্ছা) নেই, তখন কে কী করবে ? আর যখন সাংসারিক কর্ম থেকে তোমার অবকাশ-ই নেই তখন আমিই বা কী উপায় করবো ? (কী পথ নির্দেশ করবো ?)

শুনতে পাই যে তোমার বাড়িতে সৎসঙ্গ হয়ে থাকে কিন্তু তোমার সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তোমার বিবেকদৃষ্টি দিয়ে বিচার করা উচিত যে সাংসারিক কার্য অপেক্ষা সৎসঙ্গ করা কী নিকৃষ্ট মানের ?

তুমি লিখেছো যে যখন তুমি নিজের ভগবৎভজন ধ্যানের সাধন সম্পর্কে বর্তমান দশার কথা চিন্তা কর, তখন তোমার মন ক্ষিপ্ত (অবসাদগ্রস্ত) হয়ে ওঠে এবং সাংসারিক কার্যও কমে যায়। এইজন্যই আমি ভগবৎভজন, ধ্যান করার কথা বারংবার লিখে থাকি। কিন্তু তুমি সেই ব্যাপারে গুরুত্ব দাও না। ভেবে দেখা উচিত যে, সময় বয়ে যাচ্ছে। ভগবানের নিকট করা প্রতিজ্ঞার সময় এগিয়ে আসছে। যে সময় চলে গেছে তা ফিরে আসে না। অতএব মনুষ্যজন্ম সার্থক করা উচিত। অর্থাৎ ভগবৎভজন, ধ্যানের জন্য সময় বার করে নেওয়া উচিত। কেননা সময় তো একদিন অবশ্যই বার করতে হবে অর্থাৎ কালদেবতার খবর এলে পরে এক মিনিটও অপেক্ষা করা যাবে না। (মৃত্যু কারো অপেক্ষা করে না)। অতএব যদি এই কথা বিচার করে তুমি প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে যাও তো খুবই আনন্দের কথা, নাহলে পরে অনুতাপ করতে হবে।

তোমার লেখা থেকে জানতে পারলাম যে পূর্বে তোমার যেরূপ ভজন ধ্যান হত এখন আর সেরূপ হচ্ছে না। এই ধরনের কথা তোমার প্রেম এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ। আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। তুমি এখনও ভজন-ধ্যানের প্রভাবকে জানো না। যদি ভজন-ধ্যানের প্রভাবকে জানতে পারো তাহলে কখনো ভজন-ধ্যান ছাড়া থাকতে পারবে না।

তুমি লিখেছো যে আগে আমার সঙ্গের প্রভাবে বিশেষভাবে ভজন-ধ্যান হত। যদি এই কথা সত্য হয় এবং তুমি ভজন-ধ্যানের প্রভাবকে জেনে থাকো তাহলে আমার সঙ্গে বিয়োগ অর্থাৎ আমার বিয়োগ হওয়া তুমি কী করে সহ্য করলে ? যাক্, আমার সঙ্গের কথা দূরে থাক কিন্তু শ্রীনারায়ণ-দেবকে তো কোনো কালেই ভোলা উচিত নয়—অর্থাৎ নিরন্তর তাঁর চিন্তা করা উচিত এবং এরূপ প্রেম করা উচিত (অর্থাৎ এত ভালোবাসা উচিত) যে তাঁর বিয়োগব্যথা সহ্য না হয়। যেমন জল ব্যতীত মাছের প্রাণ থাকতে পারে না তেমনই তাঁর বিয়োগ ব্যথায় শরীরে প্রাণ থাকতে পারে না।

যদি তুমি সাংসারিক ভোগাপেক্ষা ঈশ্বরের ধ্যানকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতে এবং ত্রিলোকের রাজ্যকে ধ্যানের এক ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র মনে করতে তাহলে তোমার সাধন দিন দিন তীব্র হত এবং নিরন্তর ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার অভিলাষ পোষণ করতে (অর্থাৎ ইচ্ছা হত)। যদি তোমার ভগবৎ-ধ্যান এবং সৎসঙ্গের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব হত তাহলে তার জন্য চেষ্টাও থাকতো। আমার সঙ্গের জন্য তুমি যে যদ্‌কিঞ্চিৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেছো সে তোমার কৃপা। কিন্তু এ ভারী অনুতাপের কথা যে তুমি ধ্যানের আনন্দ যদ্‌কিঞ্চিৎ লাভ করেও কী করে সে আনন্দকে তিরস্কারপূর্বক ত্যাগ করলে ? যদি ধ্যান-জাত আনন্দ সত্য হয় তবে সেই আনন্দের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা কেন করো না ? আর যদি সেই ধ্যানে আনন্দ নেই তো তুমি সেই ধ্যানজনিত আনন্দের প্রশংসা কী প্রয়োজনে করো ? ঠিক আছে, যে কাজ হয়ে গেছে তাকে যেতে দাও। ভবিষ্যতে তো সাবধান হওয়া উচিত।

তুমি কোন্ কাজে তোমার এই অমূল্য সময় কাটাচ্ছো ? এই রূপ আজীবন সময় নষ্ট করতে থাকলে কি এই জন্মে নিজের কল্যাণের সম্ভাবনা আছে ? যদি কল্যাণের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে শীঘ্রই নিজের উদ্ধারের জন্য কোমর বেঁধে খুব জোরের সঙ্গে সাধনার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা শরীর তো ক্ষণস্থায়ী—এইজন্য শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। যদি তাড়াতাড়ি দেহান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কী করতে পারবে ? তুমি কীসের ভরসায় এত নিশ্চিন্ত হয়ে আছ ? তোমার কাছে কীসের বল আছে ? (তোমার কী শক্তি আছে ?)। কেবলমাত্র এক নারায়ণ ছাড়া কেউই তোমার সহায়তা করার নেই। তবে কীজন্য এই অসার সংসারের পসরা নিয়ে নিজের অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ হতে দিচ্ছ ?

[২৪]

সংসারে ভগবৎপ্রেমের প্রবাহ খুব দ্রুত গতিতে (জোরের সঙ্গে) চালনা করা উচিত। পূর্বকালে বহুবার সময়ে সময়ে এই প্রেম-প্রবাহ খুব জোরের সঙ্গে বয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে যদিও শ্রীনারায়ণদেবের পূর্ণ কৃপা বর্তমান আছে তথাপি যা কিছু দেরি হচ্ছে সে কেবল আমাদের নিজেদের তরফে।

সংসারে ভগবৎভাবের প্রচার করার জন্য যদি কিছু মানুষ তৈরি হয়ে যায় তাহলে খুব শীঘ্রই শ্রীভগবৎভক্তির প্রচার সম্ভব, কিন্তু বিদ্বান, ত্যাগী এবং সদাচারী পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ ব্যক্তি যদি স্বয়ং প্রেমে মগ্ন হয়ে সংসারে ভগবৎপ্রেম, ভক্তি প্রচার করেন তো প্রেমের প্রবাহ বেশ জোরেই বইতে পারে।

নিষ্কাম প্রেমের ভাবে ভাবিত হয়ে সকলের পরম সেবা করার সদৃশ অন্য কোনো কার্য নেই। বাস্তবে 'পরমসেবা' তাকেই বলে যে সেবার পরে কোনো কার্যের বাকি না থাকে—অর্থাৎ সংসারী মানুষগণকে ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন করে তাদের ভগবানের পরম ধামে পৌঁছে দেওয়ার নামই বাস্তবে 'পরমসেবা'। যদিও ক্ষুধার্ত, অনাথ, দুঃখী, রোগী, অসমর্থ, ভিক্ষুকাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ এবং যার যে বস্তুর অভাব আছে তাকে সেই

বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়ে সুখ পৌঁছিয়ে এবং শ্রেষ্ঠ আচরণকারী (শাস্ত্রসম্মত) যোগ্য বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি পদার্থ দ্বারা সুখ পৌঁছানোও এক প্রকারের সেবা ধর্ম। কিন্তু পরমসেবা তাকেই বলা হয় যেই সেবা করার পরে অন্য আর কোনো সেবা করা বাকি থাকে না। এই সেবার সমান আর অন্য কোনো সেবা সম্ভব নয়। এইজন্য তোমারও নিষ্কাম প্রেম-ভাবসহিত সব জীবের পরমসেবা করা উচিত।

নিজের শরীর-মন-ধন তথা আর যা কিছু পদার্থ আছে তা যদি সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক জীবের উদ্ধারের জন্য, তাদের সেবাকার্যে লাগে তো সেসব সার্থক এবং যেসব পদার্থ তাদের সেবা ব্যতীত রয়ে যায় (পড়ে থাকে) সেসব নিরর্থক—এই জেনে তাদের পরম সেবা করা উচিত। এরূপ করলে সব জীবেই খুব ভালোবাসা জন্মাতে পারে এবং সমস্ত জীবের সাথে যে নিষ্কাম প্রেম-ভালোবাসা হয় সে তো ভগবানের সাথেই প্রেম-ভালোবাসার নামান্তর—কারণ ভগবানই সব জীবের আত্মা স্বরূপ।

[২৫]

তোমার পত্র থেকে জানতে পারলাম যে কীরূপে ঈশ্বরে অনন্ত প্রেম হয়ে সাংসারিক সত্তার প্রতি আসক্তির অত্যন্ত অভাব যাতে হয় তার জন্য তুমি উপযুক্ত সাধনের কথা জানতে চেয়েছো।

প্রতিটি মুহূর্তে সংসারকে স্বপ্নবৎ মনে করে অথবা মৃগতৃষ্ণার জল অর্থাৎ মরীচিকা তুল্য দেখে সর্বত্র ভগবানের সর্বব্যাপী স্বরূপের চিন্তন করলে সাংসারিক আসক্তির অভাব বোধ হয়ে সর্বত্রই সেই শ্রীসচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মদেবই প্রতীত হতে পারে। ভগবানকে সর্বদা এবং সর্বত্র চিন্তা করলে এবং তাঁর প্রেমী ভক্তগণের সঙ্গ করলে পরমাত্মায় প্রেম-ভালোবাসা হওয়া সম্ভব।

অর্থ অনুধাবনপূর্বক শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অধ্যয়ন করলে অথবা পরমাত্মার পবিত্র নামের জপ করলে, ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে আচরণ করলে ভগবানে অনন্য প্রেম হয়ে তাঁর প্রাপ্তির জন্য তীব্র ইচ্ছা হলেই ভগবান-প্রাপ্তি অত্যন্ত শীঘ্র সম্ভব। এই কাজে মানুষের পুরুষার্থই প্রধান

বস্তু।

[২৬]

'মনস্থির' হওয়ার কিছু উপায়-এর কথা আগে লিখেছি, এখন আবারও লিখছি :

(ক) অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনের বৃত্তিসকল স্থিত হয়।

(খ) প্রত্যেকটি মুহূর্তে যত্নপূর্বক শ্বাসের দ্বারা, প্রেমসহিত প্রণবের (ওঁকারের) স্মরণ করাকেই 'অভ্যাস' বলা হয়।

(গ) 'মন' যেখানে ধাবিত হচ্ছে সেইখানেই মনকে পরমাত্মার স্বরূপে নিবেশ করা উচিত।

(ঘ) মন যাতে যায় সেই সেই বস্তুতে পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তন করা উচিত।

(ঙ) যে বিষয়ে আমাদের অধিক প্রীতি, সেই বিষয়কেই ভগবৎচিন্তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই ভগবৎবস্তুর ধ্যান করো।

(চ) কোনো একান্ত স্থানে নিভৃতে বসে 'ওঁকারে'র জপ করতে করতে নাসার দ্বারা ধীরে ধীরে প্রণববায়ুকে বাইরে এনে সামর্থ্যানুযায়ী বন্ধ করে রেখে আবার সেইভাবেই 'ওঁকার'কে জপের সাথে অপানবায়ুকে ধারণ করে ধীরে ধীরে ছেড়ে দাও। —এইগুলিই হল 'অভ্যাসের' বিভিন্ন রূপ।

(ছ) যা কিছু শুনছি বা দেখছি সেইসব বস্তুসমূহের আবেদন (স্ফুরণ) হতে চিত্তকে রহিত করে পরমাত্মায় সঁপে দেওয়ার নামই 'বৈরাগ্য'। উপরিযুক্ত প্রকারে অভ্যাস করলে এবং বৈরাগ্যের ভাবনায় ভাবিত হলে মন স্থির হতে পারে। এই সকলের মধ্যে যে সাধনায় তোমার রুচি এবং নিজের মন প্রসন্ন থাকে, আমার মতে তার অভ্যাস করাই উত্তম।

[২৭]

তুমি ভগবানে প্রেম হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো—এর উত্তর সেই পুরুষই উত্তমরূপে জানতে পারেন যাঁর ভগবানে পূর্ণ প্রেম আছে। তবুও যখন তুমি জিজ্ঞাসা করেছো কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। উত্তম পুরুষেরা বলে থাকেন যে ভগবানের প্রভাব (লীলা) এবং তাঁর

গুণানুবাদের কথাসকল পড়তে শুনতে এবং ভগবৎ-নাম জপ করতে থাকলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং তবেই ভগবানে পূর্ণ প্রেম হতে পারে। তাঁর চিন্তায় নিষ্কামভাব নিয়ে তাঁর গৌরব ব্যাখ্যায় এবং গুণানুবাদের কথা আলোচনা করলে তথা তাঁর গুণ এবং প্রভাবকে জানতে পারলে ঈশ্বরে প্রেম হওয়া সম্ভব। প্রেম হওয়ার পরে প্রেমী পুরুষ প্রেমের কিছুমাত্র কথা শুনলেই রোমাঞ্চ অনুভব করে, অশ্রুপাতাদি প্রেমের আনন্দচিহ্ন প্রত্যক্ষ হতে থাকে। প্রেমাস্পদের কাছ হতে আসা অতি সাধারণ মানুষও বড় প্রিয় বোধ হয়। একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রীতি হলে যখন তার গুণের কথা কিংবা ভালোবাসা সম্পর্কিত কথা শুনে আনন্দ হয়, তাহলে প্রেমিক শিরোমণি ভগবানের কথাই আলাদা। উদ্ধবের কথা শুনে গোপীগণের যেমন প্রেম হয়েছিল সেরূপ প্রেম আজও হওয়া সম্ভব। প্রেমে যত ত্রুটি থাকবে ততই তাতে বিলম্ব হবে। ভগবান তো সর্বত্র বিরাজমান। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি লুক্কায়িত থাকেন।

তুমি লিখেছো যে আজকাল ভজন কম হয়। এর কারণ কী, ভজন কম যখন হচ্ছে তখন প্রেমও কমেছে বলেই বোঝা উচিত। সংসার তথা শরীরাদি অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী বুঝলে বিলম্ব হতে পারে না। ভজনা অধিক হওয়ার উপায় অন্য পত্রে লিখেছি। কেবলমাত্র সময়কে অমূল্য জানতে হবে, এরপরে আর কিছু করার আবশ্যকতা থাকে না। যদি কিছু করতে চাও তো সেই পরমপ্রিয় ভগবানের সাথে নিষ্কাম ভাব নিয়ে পূর্ণ প্রেম হওয়ার জন্য নিজের যথাসর্বস্ব তাঁহাতে অর্পণ করো। নিজের এই শরীর এবং নিজের প্রাণ যদি এই কাজে লাগে তাহলে জীবন ধন্য মানা উচিত। সৎসঙ্গ করার পরেও পরমাত্মায় মন লাগে না, এরূপ কদাপি অসম্ভব। সৎসঙ্গের দ্বারা তো উদ্ধার হওয়া যায়। যদি এখনও পর্যন্ত সৎপুরুষের সঙ্গ পাওয়া না যায়, তবে তো অন্য কথা। ভজনার জন্য সময় থাকে না লিখেছো, কিন্তু এর জন্য তো সময় বার করতেই হবে। একদিন সবাইকেই চিরকালের জন্য এইখান থেকে সরে যেতে হবে। (অর্থাৎ

মৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই)। যে প্রথম থেকেই সময় বার করে নেয় সেই চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়ে সুখী হয়।

[২৮]

তোমার বাবার এবং পুত্রের মৃত্যু সংবাদ ------ কাছ থেকে জানলাম। তোমার পিতার দেহান্তের সংবাদে ততটা বিচলিত না হলেও তোমার পুত্রবিয়োগের সংবাদে যথেষ্ট বিচলিত হয়েছি। কিন্তু যাতে নিজের কোনো জোর চলে না তার জন্য কী করা যাবে। চিন্তা করেও কোনো লাভ নেই। অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে লিখেছে যে তোমাকে খুব চিন্তা এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়—সেকথা ঠিক। কিন্তু এই প্রকারের ঘটনার পরেও যদি বৈরাগ্য না হয় তাহলে সেটি বড়ই আশ্চর্যের কথা।

আমি তোমাকে কী ধৈর্য ধরতে বলবো ? সংসারে লোক অপরকে ধৈর্য ধরাবার জন্য বড় বড় উপদেশ দিয়ে থাকে কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তেমন বিপদ এলে যে ধৈর্য দেখাতে পারে সেই সত্যিকারের ধৈর্যবান এবং তারই উপদেশ দেওয়া যথার্থ জানবে। আমি তো কেবল মিত্রভাব থেকে তোমায় লিখছি। যদি কিছু ভুল হয়ে যায় ভালোবাসার খাতিরে তোমার নিকট সদাই ক্ষমাপ্রার্থী।

যা কিছু অবশ্যম্ভাবী তা তুমি এড়াতে পারবে না। অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা তো প্রসিদ্ধ। আরও এমন অনেক ঘটনা আছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তো এরূপ বলেই থাকেন যে সংসারে চিন্তা করার মতো কিছুই নেই। নিম্নে লিখিত ভগবানের এই উপদেশের একটি পদও যদি ভালো করে বুঝতে পারা যায় তো আর কোনো চিন্তা হতে পারে না।

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'

অশোচ্য বিষয়ে শোক করা অনুচিত—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে কথাই বলে থাকেন। পণ্ডিত ব্যক্তি কখনোই গত হয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে শোক করেন না, যা আর কখনোই আগত হবে না।

—এর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করলে চিন্তার আর কিছুই থাকে না। যদি

চিন্তার কিছু অবশেষ থাকে তবে সেটি হল ঈশ্বর-লাভের চিন্তা।

[২৯]

ক্রোধের আধিক্য যাতে না হয় তার উপায় জিজ্ঞাসা করেছো। নিম্নলিখিত উপায়ে স্বতই ক্রোধের বিনাশ হয়ে যায়—

(ক) সর্বত্র একমাত্র বাসুদেব ভগবানেরই দর্শন করো। যখন ভগবান ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো বস্তুই থাকবে না তখন ক্রোধ কিসের পরে হবে ?

(খ) যদি সব কিছুই নারায়ণ হয় তবে নারায়ণের প্রতি ক্রোধ কী করে হবে ! সব কিছু নারায়ণ হওয়ায় আমি এই সকল নারায়ণের দাস। সেই নারায়ণের ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু হয় আর সেই প্রভুই সব কিছু করেন, তবে ক্রোধ কার উপর করবে ?

(গ) নারায়ণের আশ্রয় নেওয়া উচিত। যা কিছু হয় সে তাঁর আজ্ঞাতেই হয়। নিজের ইচ্ছা প্রয়োগে নারায়ণের কাছে শরণাগতিতে অপরাধ হয়। মালিক নিজে যা চান তাই করুন—আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এরূপ ভাবনা হওয়া উচিত। কামবস্তু না পেলে ক্রোধ আসে। 'ইচ্ছা' বা 'আসক্তি' না থাকলে ক্রোধও হয় না।

(ঘ) সমস্ত বস্তুকে কালের মুখে (কালকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করে কাল-ভগবান আখ্যা দেওয়া হয়েছে) দেখা উচিত। অল্প দিনের এই পৃথিবীতে এসে আমি কেন ক্রোধ করবো, এ সংসারে সবই অনিত্য। সময়ানুসারে সবকিছুরই নাশ হবে। জীবন খুব অল্প দিনের। কারো মনে কষ্ট হয় এমন কাজ করার কী দরকার ?

(ঙ) যখন নিজের থেকে বয়স্ক লোকের উপর ক্রোধ হবে, তখন তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং তাঁর চরণে পড়ে গেলে অথবা যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করেন তখনও তাঁর চরণ ধরো তথা হাসিমুখে প্রসন্ন মনে তাঁর সঙ্গে কথা বলো অথবা চুপ করে থাকো।

(চ) যদি নিজের থেকে কমবয়সী লোকের উপর ক্রোধ উৎপন্ন হয় তো তার হিতের জন্য শুধুমাত্র দেখানোর মতো ক্রোধ হওয়া উচিত। নিজের

স্বার্থের ত্যাগ হওয়া উচিত—ইচ্ছা বা কামনাই ক্রোধের মূল।

যাতে 'কামনা'র নাশ হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। ভগবানের স্বরূপ ও নামের চিন্তা না করলে সমূলে ক্রোধ নাশ হওয়া কঠিন।

[৩০]

তুমি পরমাত্মায় প্রেম বৃদ্ধির উপায় জানতে চেয়েছো, তা অতি উত্তম কথা। সেই পুরুষই ধন্যবাদের যোগ্য যার পরমাত্মায় প্রেম ভালোবাসা হয়েছে। আমি তো একজন সাধারণ মানুষ, এ ব্যাপারে কী-ই বা লিখবো ? কিন্তু তোমরা জিজ্ঞাসা করলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কিছু লেখা উচিত।

আমার মতে পরমেশ্বরের প্রভাব এবং রহস্য জানতে পারলে তাঁতে প্রেম বৃদ্ধি হয়। পরমেশ্বরের সমান এই সংসারে ভালোবাসার জন (ভালোবাসার যোগ্য ব্যক্তি) দ্বিতীয় আর কেউই নেই। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে ভালোবাসে সে সবাইকে ভালোবাসার জন্য তৈরি থাকে। যিনি যাঁকে ভালোবাসেন তিনি যত নীচু স্তরের হোন না কেন, তাঁর নীচতার প্রতি তিনি কখনো খেয়াল করেন না।

যখন ভগবানের ভক্তেরই এরূপ স্বভাব হয় তাহলে স্বয়ং প্রভুর তো কথাই আলাদা। পরমেশ্বরের প্রভাব জানার জন্য তাঁর ভক্তদের সঙ্গ, নাম-জপ, স্বরূপের ধ্যান এবং যথাসাধ্য তাঁর আজ্ঞার পালন সব থেকে উত্তম পন্থা জেনে তা পালন করতে থাকুন। এর থেকে ভালো উপায় আমার মতে আর কিছুই নেই।

[৩১]

'সর্বব্যাপী' বিরাজমান ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ সাধনায় কিছু ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে—এরূপ চিঠি থেকে জানতে পারলাম, তাতেও কোনো চিন্তা নেই। তোমার সগুণ-ভগবানের ধ্যানের সাধনা করা উচিত। সগুণে প্রেম হলে তাঁর দর্শনের পর নির্গুণের তত্ত্ব খুব শীঘ্রই জানা যায়। প্রজ্বলিত অগ্নির তত্ত্ব জানা হয়ে গেলে ব্যাপক (ব্যাপৃত) অগ্নির জ্ঞানও অতি শীঘ্রই হয়ে যায়।
—এই কথা জেনে 'প্রেমভক্তিপ্রকাশ' নামক পুস্তকে লেখানুসারে সগুণ

ভগবৎচরণের ধ্যান করা উচিত। তুমি লিখেছো যে পরমাত্মার স্বরূপে মন লয় হয়ে যাচ্ছে না—এই ব্যাপারে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। সগুণ ভগবানের ধ্যান প্রেমে তন্ময় হয়ে করা উচিত যাতে তোমার নিজের শরীরের বোধ না থাকে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু ভগবান অথবা দ্বিভুজ মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণ—এই দু-এর মধ্যে তুমি তোমার রুচিমতো যে কোনো স্বরূপের ধ্যান করতে পারো।

তুমি লিখেছো যে 'বুদ্ধি এখনও পর্যন্ত পরমাত্মার স্বরূপকে নিশ্চিত রূপে ধারণ করতে সফল হয়নি।' বাস্তবে শুদ্ধ সৎ-চিৎ-আনন্দঘনের স্বরূপ বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিত হওয়ার বস্তু নয়। নির্গুণের ধ্যান হওয়ার বিষয় কঠিন। এর তুলনায় সগুণের ধ্যান অনেক সুগম। দুটোরই ফল সমান। অতএব তোমার সগুণ ধ্যানই করা উচিত।

তুমি লিখেছো যে 'এরূপ উৎকণ্ঠা হওয়া উচিত যে এক নারায়ণ ছাড়া আর কিছুই যেন না থাকে।' এরূপ উৎকণ্ঠা গোপীগণের ছিল। তাঁরা যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন, তখন তাঁরা আর কোনো কিছুই দেখতে পেতেন না। অভ্যাস করলে তোমারও সে দশা হতে পারে।

সাধনার ত্রুটি বিষয়ে লিখেছো—সে তো আছেই কিন্তু সৎসঙ্গ এবং জপের অভ্যাস বৃদ্ধি হলে ত্রুটি দূর হয়ে যায়। সগুণ ভগবানের সাক্ষাতের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা হলে তাঁর দর্শনও হতে পারে। এছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। ভগবৎপ্রেমের এতটা প্রবলতা হওয়া দরকার যাতে ভগবানের দর্শন না পেয়ে কিছুতেই থাকা না যায়। এরূপ তীব্র উৎকণ্ঠা হলে ভগবানের সাক্ষাৎ হতে পারে।

মাতা পিতার সেবায় ত্রুটি হওয়ার খবর জানলাম। এরূপ কেন হয় ? মাতাপিতার সেবা তো পরম ধর্ম। কিন্তু এই ত্রুটিও ভগবানের ভজনের দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। নিরন্তর ভগবৎভজন না হলে দোষের সম্পূর্ণ নাশ হওয়া কঠিন। যে ব্যক্তি মা-বাবার সেবা করে না তার জীবনকে ধিক্কার। মাতাপিতাকে কখনোই অসন্তুষ্ট করতে নেই। ভজন-ধ্যান-সৎসঙ্গের জন্যও তাঁদের স্বার্থপর আদেশের উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। নিজের স্বার্থের জন্য অতি বড় কাজও মাতাপিতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে করা উচিত নয়। যদি

এরূপ কোনো আজ্ঞা (আদেশ) হয় যা মানতে গেলে মাতা-পিতার উদ্ধারে বাধা পড়ে, তাঁদের পাপের ভাগী হতে হয় তাহলে তেমন আজ্ঞা একদমই মানা যায় না। যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর পিতার মঙ্গলের জন্য পিতার আদেশ অমান্য করেছিলেন।

এই দৃষ্টিতে এ কথা বলা যায় যে যদি ভজন-ধ্যান-সৎসঙ্গে বাধা সৃষ্টিকারী কিংবা এমন কোনো আদেশ যা 'হিংসা' উৎপন্ন করে সেটি না মানলে পুত্রের কোনো দোষ হবে না, কারণ সে পিতামাতাকে পাপের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, তাঁদের মঙ্গলের জন্য এটা করছে ; নিজের স্বার্থের জন্য করছে না। এইসব ব্যাপারগুলি বাদ দিয়ে সংসারের অন্য কোনো কর্মে তাঁদের আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। ধনসম্পত্তির কথা দূরে থাক, যদি তাঁদের আজ্ঞা পালন করতে প্রাণ চলে যায় তাহলেও কোনো আপত্তি নেই। কারণ এই শরীর তো তাঁদেরই রজ-বীর্যে তৈরি হয়েছে, তাঁরাই এ শরীরকে পালন করেছেন। এই শরীরের উপর আমাদের কী অধিকার আছে ? এই শরীরের উপর নিজেদের প্রভুত্ব মেনে নেওয়া তো তাঁদের অবাধ্য হওয়ার সমান। এই সংসারে এমন অনেক মূর্খ আছে যারা স্ত্রী, পুত্র, ধন ও আরামের জন্য মাতাপিতার শত্রু হয়ে তাঁদের কষ্ট দেয়। তাদের মহা দুর্গতি হয় এবং এই পাপের দরুন ভয়ানক নরকে যেতে হয়। যদি 'শাস্ত্র' সত্য হয় তাহলে এরূপ পুরুষগণের উদ্ধার হওয়া কঠিন।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে ভগবানের ভজন-ধ্যান এবং সৎসঙ্গে অত্যন্ত নীচ প্রাণীও উৎরে যায়, কিন্তু অনেক দিনের পুরানো রোগে ঔষধও অনেক দিন ধরে নিতে হয়। এইরূপে যার যত বেশি পাপ, তার ভগবৎদর্শনে ততই বিলম্ব হয়। পাপের কারণে তাদের ভগবানে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না, এইজন্য পাপ নাশ করার জন্য তাদের দীর্ঘকাল ভজন করতে হয়। অতএব পাপকাজ হতে বিরত থেকে সর্বদা ভগবানের ভজন করতে হয়।

[৩২]

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি লিখেছো যে দ্রষ্টা রূপে ধ্যান তোমার প্রায়

নিরন্তর হচ্ছে, ঘুমানো বা নিদ্রা হতে উত্থান সকল অবস্থাতেই এই স্থিতি বজায় রয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু অচিন্ত্যের ধ্যানের স্থিতি বরাবর এক রকম থাকে না। ধ্যানের সময় বিলক্ষণ অচিন্ত্যের ধ্যান হয়ে থাকে কিন্তু এই বিলক্ষণতাকে যে জানে, তার ধ্যানের পরে সেই বৃত্তির অভাব আর হয় না। এর দ্বারা বোঝা যায় যে ধ্যানের সময়ও সেই অনুভবকারী বৃত্তি অপ্রত্যক্ষরূপে ছিল—সে কথা ঠিক। তুমি লিখেছো যে আমার এই সাধনার স্থিতি পূর্বের মতোই বর্তমান, গত বছরের মতো তীব্রভাবে সাধনার বৃদ্ধি হয়নি, যেন থমকে গেছে বলে মনে হয়। ঠিক আছে, তোমার সাধনার গতি থেমে যায়নি। কেবলমাত্র তোমার মনে হচ্ছে যেন থমকে গেছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর সাধনার বৃদ্ধি হয়েছে তবে থমকে দাঁড়িয়ে আছে এমন মনে হওয়ার কারণ হল—এক, সাধন খুব তীব্র গতিতে বৃদ্ধি না হলে অল্প সাধনার বৃদ্ধি বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয়ত গত বর্ষে যেমন কোনো ছাত্র যদি আগে কখনো ব্যাকরণ কৌমুদীর পূর্বার্ধ অধ্যয়ন করে থাকে এবং মাঝখানে তার বিস্মরণ হয়েছে এবং কিছুকাল পরে আবার ফিরে পড়া আরম্ভ করলে পূর্বে অধীত হয়ে থাকার কারণে খুব শীঘ্রই সেটি স্মরণে এসে যায় কিন্তু উত্তরার্ধে (পরের ভাগ) মুখস্ত করতে বিলম্ব হয়। ঠিক তেমনই তোমার পূর্ব-কৃত সাধন অল্প প্রচেষ্টাতেই প্রকট হয়েছে। জমিতে পোঁতা লুক্কায়িত অজ্ঞাত ধন প্রাপ্তির ন্যায় তোমার পূর্বলব্ধ অজ্ঞাত সাধনসমূহ অকস্মাৎ প্রকট হওয়ার জন্য সাধন এবং তার স্থিতি তোমার কাছে অতি দ্রুত লব্ধ বলে বোধ হচ্ছে। গত বছর এবং এই বছরের স্থিতিতে ফারাক হওয়ার এটাই কারণ। সাধন থমকে যায়নি এবং গত বছরের অপেক্ষা এর গতি মন্থরও হয়নি। সাধনার অগ্রগতি কম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তার কারণ হল এই যে গত বছর বেশি উন্নতি বোধ হওয়ার ফলে মনে আনন্দের ভাব বর্তমান হেতু উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল, ফলে সাধনাতেও বিশেষ তীব্রতা বৃদ্ধি হয়েছিল। এই বছর অগ্রগতি কম বোধ হওয়ার কারণে অতটা উৎসাহ সহকারে সাধন হয়নি কিন্তু তোমার সাধনার বৃদ্ধি হয়েছে। যেমন কোনো সন্নিপাতিক রোগীর সন্নিপাত দোষ

মিটে গেলেও সামান্য ব্যথা তার পেটে থাকতে পারে, তখন সে বৈদ্যকে বলে যে তার পেটে ব্যথা আছে সে ঠিক হয়নি। বৈদ্য বলেন 'ভাই ! তোমার প্রধান রোগ সেরে গেছে এখন পেটে মামুলি হালকা ব্যথা হলে এর জন্য চিন্তা কী ?' তোমারও সেই অবস্থাই হয়েছে।

তুমি লিখেছো 'এখন বিলম্ব কী কারণে হচ্ছে ?'—বিলম্ব এই কারণেই হচ্ছে যে সাধক এই বিলম্ব সহ্য করছেন। যদি প্রভুর বিয়োগ সাধকের এতটা অসহ্য হয়ে যায় যে প্রাণ শরীর হতে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। সাধক যতক্ষণ পরমাত্মার সঙ্গে এই মিলনে দেরি বরদাস্ত করছেন, যতক্ষণ ভগবান ছাড়াই তাঁর কাজ চলে যাচ্ছে ততক্ষণ ভগবানও দেখেন যে আমায় ছাড়াই তো এর চলে যাচ্ছে তবে আমারও এত শীঘ্রতার কী প্রয়োজন ? যেদিন ভগবান ছাড়া সাধক থাকতে পারবেন না, সেদিন ভগবানও তাঁর ভক্ত ছাড়া থাকতে পারবেন না। কারণ ভগবান তো পরম দয়ালু, দেরি যেটুকু সেটুকু ভগবানকে চাইবার, পাওয়ার দেরি নেই। বাস্তবে তুমিই তার মিলনের জন্য বিলম্ব করছ।

তুমি লিখেছো যে 'আমার সাধনা, প্রেম তথা বল (সামর্থ্য) আগেও এমনই ছিল'—সেকথা ঠিক নয়। সাধনা, প্রেম এবং শক্তি আগেও বৃদ্ধি হয়েছিল, এখনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তুমি উপলব্ধি করতে পারছো না। নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কামভাবের যা কিছু পুঁজি একবার জমা হয়ে যায় তা কখনো কমে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। সাধক চাইলে একে অনেক বৃদ্ধি করতে পারেন। যেমন সোনা গলাবার পাত্র অর্থাৎ 'মুচি'র যে অংশটুকু একবার সোনাদ্বারা ভরে যায় সেটি আর খালি হয় না, প্রয়োজন হল মুচির খালি অংশটুকু সোনা দিয়ে ভরাট করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সোনা গলাবার কর্মী অর্থাৎ সাহুকার সোনাকে শুদ্ধ করার জন্য আসল সোনা, এখানে ওখানে ছড়ানো সোনার টুকরো বা বিভিন্ন বস্তু মিশ্রিত সোনা—এই সবকে মুচিতে ঢেলে তার সাথে সোহাগা মিশিয়ে আগুনে চড়িয়ে দেয়। আগুনে ক্রমাগত ফুঁ দিতে থাকলে সেই আগুন কখনো

নেভে না উপরন্তু অধিকতর তেজের সঙ্গে প্রজ্বলিত হতে থাকে। আগুনের তাপে মুচিতে পড়ে থাকা সোনা সোহাগার প্রভাবে গলে নিজের স্বাভাবিক শুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভারী হওয়ার ফলে মুচির নিম্নভাগে জমতে থাকে। সোনার সঙ্গে মিশ্রিত অন্যান্য ধাতু আলাদা হয়ে ওপরে উঠে আসে এবং সর্বাপেক্ষা হালকা আবর্জনা আদি সবার উপরে থাকে। ক্রমাগত আগুনের তাপে আবর্জনা এবং অন্যান্য বিজানীয় ধাতু পুড়ে যায়। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ সোনা মুচির নীচের অংশে জমা থাকে। মুচির খালি স্থানে বারবার উপর থেকে অন্য সোনা দেওয়া হতে থাকে যাতে ধীরে ধীরে সমস্ত মুচিটি শুদ্ধ খাঁটি সোনায় ভরে যায়। কুঁড়ো কাঁকর এবং অন্য ধাতু যা কিছু থাকে হয় তার ভিতরেই জ্বলে যায় আর না হলে খাঁটি সোনায় ভরা মুচিতে জায়গা না পেয়ে উপছে পড়ে আগুনে পড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সোনা থেকে যাবতীয় নোংরা ও অন্য ধাতুসমূহকে আলাদাকারী সোহাগাও নিজের কাজ সম্পন্ন করে পুড়ে যায়। শেষে মুচি ভর্তি যে জিনিস রয়ে যায় তা খাঁটি সোনা। তার দ্বারা চিরদিনের জন্য দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। এটি একটি উদাহরণস্বরূপ। এই উদাহরণে সোনা গলাবার পাত্র 'মুচি' হচ্ছে সাধকের হৃদয়। নিষ্কাম ভজনা, ধ্যান, সেবা এবং সদাচার হল আসল সোনা। আর কাম, ক্রোধ, অজ্ঞান, সংশয়, বিষয়াসক্তি, প্রমাদ, অভিমান ও আলস্য—এই আট প্রকারের দোষ হল অন্যান্য ধাতু। সাংসারিক বিষয়াদির চিন্তা হল কুঁড়ো-কাঁকর। তত্ত্বজ্ঞান হল অগ্নি। সৎসঙ্গ হল সেই অগ্নিকে বাড়ানোর সাহায্যকারী ফুঁ (অর্থাৎ বায়ু)। শাস্ত্রের বিচার হল সোহাগা এবং পরমাত্মার অভাববোধই ওই সোনা গলাবার পাত্রের শূন্য স্থান।

হৃদয়রূপ পাত্রে নিষ্কাম ভজনা, সেবা ও সদাচার আদি স্বর্ণের সাথে কাম ক্রোধাদি দোষরূপ অন্য ধাতু এবং সংসারের চিত্ররূপ কুড়ো-কাঁকরও পড়ে থাকে, কিন্তু সৎসঙ্গরূপ বায়ু ফুঁ দিলে বৃদ্ধি হওয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপী অগ্নির তাপে শাস্ত্রসমূহের বিচাররূপ সোহাগার সাহায্যে হৃদয়রূপ পাত্রের তলভাগ নিষ্কাম ভজন, ধ্যান সেবা ও সদাচাররূপ শুদ্ধ

সোনায় ভরে যায়। কাম-ক্রোধাদি দোষরূপ অন্যান্য ধাতু এবং সংসারের আকর্ষণ-চিন্তনরূপ কুঁড়ো এবং নোংরা আবর্জনা জ্বলে যায়। শাস্ত্রবিচাররূপ সোহাগাও স্বর্ণকে শুদ্ধ করে নিজে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন কেবল নিষ্কাম ভজনা, ধ্যান, সেবা ও সদাচাররূপী শুদ্ধ সোনাই অবশিষ্ট থাকে। (এইরূপে সাধকের হৃদয়ের যতটা স্থান নিষ্কাম ভজনাদি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তার কখনো বিনাশ হয় না। কিন্তু সেই হৃদয়রূপী পাত্রের যতটা স্থান পরমাত্মার জ্ঞানের অভাবজনিত শূন্যতায় রয়ে যায় সেটা যতদিন না পূর্ণ হয় ততদিন অজ্ঞানরূপী দারিদ্রতা সর্বতোভাবে নাশ হয় না।)

যেমন কলকাতাগামী কোনো যাত্রীর কাছে যদি ভাড়ার টাকা অল্প কিছু কম হয় তাহলে কলকাতা যাওয়ার টিকিট সে পাবে না। যতটা পয়সা কম হবে ততটা কম দূরত্বের টিকিট পাওয়া যাবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর জন্য টিকিটের পুরো পয়সাই লাগবে। ঠিক সেই প্রকার সাধকের হৃদয়ও যতক্ষণ পুরো ভরে না যায় ততক্ষণ তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। যতটা স্থান শূন্য থাকে ততটাই তিনি পরমাত্মা হতে দূরে থাকেন। হৃদয়রূপী মুচিকে (পাত্রকে) উপর-তল পর্যন্ত ভরে দেওয়ার জন্য বারংবার স্বর্ণ ঢালা উচিত এবং সেটা গলিয়ে শুদ্ধ করার জন্য তত্ত্বজ্ঞানরূপী অগ্নি ও সেই অগ্নিকে প্রবল তেজী রাখার জন্য সৎসঙ্গরূপ বায়ুর ফুঁ তথা কাম, ক্রোধাদিরূপ ধাতুসমূহ ও সংসারের বিভিন্ন কুঁড়া অর্থাৎ আবর্জনাসমূহকে আলাদা করার জন্য শাস্ত্রবিচাররূপ সোহাগা চালতে থাকা জরুরি। এই সব কর্ম নিরন্তর হয়ে যাওয়া উচিত। এরমধ্যে নিষ্কাম-ভজন, ধ্যান, সেবা ও সদাচাররূপী স্বর্ণ ও সৎসঙ্গরূপ বায়ুর ফুঁ দেওয়াকে প্রধান বলে জানতে হবে। স্বর্ণ ছাড়া অন্যান্য সব কিছু থাকলেও দারিদ্র দূর হতে পারে-না। স্বর্ণ বিনা বায়ুর ফুঁক বা ফুঁ দেওয়া রূপ সৎসঙ্গ দ্বারা কী হতে পারে ? ঔষধ ছাড়া শুধুই বৈদ্যের সুপরামর্শ দ্বারা কী হবে ? এইজন্য নিষ্কাম ভজন ধ্যান, সেবা ও সদাচার আদি তো নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু সৎসঙ্গরূপ বায়ুর ফুঁ না হলে তো তত্ত্বজ্ঞানরূপী অগ্নি নির্বাপিত (নিভে যাওয়ার) হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এইজন্য সৎসঙ্গও অন্যতম প্রধান।

যদ্যপি এই অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হলে সহজে নেভে না, কখনো বা যদি নেভে তো অন্যান্য সমস্ত বস্তুকে পুড়িয়ে কেবল শুদ্ধ স্বর্ণ পড়ে থাকাকালীন অবস্থায় নেভে। আর এই সৎসঙ্গরূপ বায়ুর ফুঁ সহজে থামে না। সাধারণ আগুন তো কেবলমাত্র সোনাকে গলিয়ে নিখাদ শুদ্ধ করে কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি উত্তরোত্তর স্বর্ণের বৃদ্ধি করে থাকে। এইরূপে ওই হৃদয়রূপ পাত্র (সোনা গলাবার মুচি) বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নিষ্কাম ভজনা, ধ্যান, সেবা এবং সদাচারাদি দ্বারা হৃদয় ভরে যাওয়ার নামই ঈশ্বর-প্রাপ্তি। যেমন ক্রমাগত গ্রাসের দ্বারা পেট ভরে যায় সেই প্রকার এই স্বর্ণদ্বারা হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেলেই ঈশ্বর লাভ হয়। তারপর শূন্য স্থান কিঞ্চিৎমাত্র থাকে না, একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অতএব উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে নিরন্তর পূর্ণরূপে তৎপর থেকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত।

তুমি লিখেছো যে 'সাধনায় উন্নতির জন্য আমার বল (শক্তি) ও প্রেম ভালোবাসা কিছুই ছিল না। যা কিছু হয়েছে সে প্রভুর অদ্ভুত অনুগ্রহেই হয়েছে।'—হ্যাঁ এইরকম মেনে নেওয়া অতি উত্তম। বিশেষভাবে বলতে গেলে এই কথাই বাস্তবিক সত্য। ভগবৎপ্রাপ্তিতে পুরুষার্থই প্রধান। পুরুষার্থ হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা প্রধান এবং সব জীবের উপর ভগবানের কৃপা নিরন্তর বইছে। সেই লাভ ওঠাতে পারে যে একথা মানে। যেমন কোনো ব্যক্তির নিকট পরশপাথর আছে এবং পরশপাথরের স্পর্শে চাইলে সমস্ত লোহার জিনিস সোনায় পরিণত করে দারিদ্রতা দূর করা যায়, কিন্তু যদি কেউ পরশপাথরকে পরশপাথর বলে না মানে তাতে পরশ-পাথরের কী দোষ ? পরশপাথরকে পরশপাথর বলে বোধ হলে তবেই তা হতে লাভ হবে—এই ভগবৎকৃপাও সেইরূপ। এইজন্য ভগবানের কৃপা মেনে নেওয়াতেই পরম লাভ। সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবানের কৃপা মেনে নেওয়াতেই পরম লাভ। সৎসঙ্গের দ্বারা ভগবানের প্রভাব জানা যায়। ভগবানের প্রভাব বুঝতে পারলে ভগবৎকৃপার অনুভব হয়, ভগবৎকৃপার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থের বৃদ্ধি হয় এবং পুরুষার্থ দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

তুমি প্রশ্ন তুলেছো 'নিত্যাভিযুক্ত না হলে পরমাত্মা কারো যোগ ও ক্ষেম কেন বহন করবেন ?'—সে কথা ঠিক। নিত্যাভিযুক্ত তো হওয়াই উচিত, কিন্তু যোগক্ষেম না চাওয়াই উচিত। যদিও যোগ ও ক্ষেম প্রার্থনা করায় বিশেষ দোষ নেই তবুও 'নির্যোগক্ষেমী'র অবস্থা তার থেকেও উত্তম। 'নির্যোগক্ষেমী হলে আমি সত্বর ভগবান লাভ করবো'—এইরূপ ভাবনার চাইতেও 'নির্যোগক্ষেমী' হওয়া আরও উত্তম। কিন্তু সব থেকে উত্তম কথা হল এই যে কোনো কিছুরই প্রাপ্তির বাসনা না থাকা। তাকে পাওয়া যাক বা নাই যাক—এইরূপ ভাবনা নিয়ে পরমাত্মায় অনন্য প্রেম করা উচিত। এরূপ করলে পরমাত্মা ভগবান সাধকের ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন। যেমন কোনো মজদুর মালিককে চার আনা মজদুরী পাওয়ার জন্য সেবা করে, তার থেকে সেই মজদুর উত্তম যে নিজের মুখ হতে মজদুরী (পারিশ্রমিক) চায় না। যে বলে আমি মুখফুটে কিছু বলবো না, সে মনে ভাবে আমি কিছু না বললে মালিক কিছু বেশি পয়সা দেবে। বাস্তবে তাই হয়। উদার মালিক মনে করেন এ যখন নিজের মুখে কিছু বলছে না তবে একে কিছু পয়সা বেশি দেওয়া উচিত। এইরূপ বিচার করে সহৃদয় মালিক তাকে চার আনার জায়গায় ছয় আনা দিয়ে দেয়। এইজন্য নিজের মুখে কিছু না চাইলেও লাভ বেশি হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে যোগক্ষেম চাওয়া অপেক্ষা না চাওয়াতেই শীঘ্র লাভের আশায় নির্যোগক্ষেমী হওয়া উত্তম। কিন্তু সেই মজদুর (শ্রমিক) যদি একদম কিছুই না নেয়, দিলেও স্বীকার করতে না চায়, তবে মালিকের বড় সংকোচ হয় ও তিনি আগের থেকেও বেশি দিতে চান। কিন্তু যখন সে কোনো প্রকারেই কিছু গ্রহণ করে না তখন মালিক তার কাছে ঋণী রয়ে যান।

এরূপে যখন সাধক পরমাত্মার কাছ থেকে কিছু নিতে চান না কেবল ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসেন, যদি তাঁর ভাব এরূপ হয় যে আমার শুধু ভালোবাসলেই সুখানুভূতি হয়, আমার শুধু ভালোবাসা চাই—তখন পরমাত্মা তাঁর কাছে ঋণী রয়ে যান। তখন সেই প্রেমীর কাছে পরমাত্মা আর না এসে থাকতে পারেন না—যদি তিনি না এসে থাকতে পারেন তাহলে তাঁর মর্জি। সেই প্রেমী কেবল প্রেমেই প্রমত্ত থাকেন। তুমি যে বুঝেছো

পরমাত্মার প্রেমে বিষমতা থাকা অসম্ভব—সে ঠিকই বুঝেছো। বাস্তবিকই পরমাত্মার কৃপায় কোনো বিষমতা নেই।

তুমি লিখেছো যে 'পদে পদে প্রভুর কৃপা প্রকট হওয়ার অনুভব কেন হয় না ?'—এ কাজে তোমার পূর্বকৃত পাপই বাধাস্বরূপ। পুরুষার্থ দ্বারাই এই প্রারব্ধের অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়। পাপরূপী 'তম'-এর নাশ হলেই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছাদনকারী মেঘ সরে গেলে সূর্য প্রকট হওয়ার মতো ভগবৎকৃপারূপী সূর্য প্রকট হয়। ভগবৎকৃপারূপ সূর্য তো আছেই—পাপরূপী 'তম'দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণরূপী দৃষ্টি আচ্ছাদিত রয়েছে। এইজন্যই সেই কৃপাসূর্য আমাদের নজরে আসে না। এইজন্য ভগবৎকৃপা যে নিরন্তর প্রবহমান—একথা মেনে চলা উচিত। এইরূপ মেনে চলতে থাকলে কখনো না কখনো তীব্র সাধনায় তমগুণ নষ্ট হয়ে ভগবৎকৃপা প্রকট হবে।

তুমি লিখেছো যে 'ভালোবাসা পূর্ণ না থাকলেও ভালোবাসার প্রতিদান জোর করে দিতে আপত্তি কী ?' পরমাত্মা তো ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু প্রেম অধিগ্রহণ করার তৎপরতা অকৃত্রিম হতে হবে। যখন পরমাত্মার জন্য লজ্জা, ভয়, ধর্ম, নীতি, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, সংকোচ, ধন, মান, অপমান, পরিবার ও পুত্রাদি সবকিছু ভুলে কেবল তাঁকে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জাগে তখন তাঁকে পেতে আর বিলম্ব হয় না। উপরিউক্ত সমস্ত বস্তুকে জেনে শুনে ত্যাগ করা উচিত নয়। জেনেশুনে জোর করে ত্যাগ করলে হিতে বিপরীত হয়। এরূপ আচরণ তো প্রমাদ (পাগলামি) এবং দম্ভস্বরূপ। কিন্তু প্রেমের বিহ্বলতায় যখন কোনো হুঁশ থাকে না তখন যদি স্বতই ওই সব ত্যাগ হয়ে যায় তখন তাকে প্রেমের জন্য ত্যাগ বলা হয়। যেমন বিদুরের পত্নী-প্রেমের প্রগাঢ়তায় যোগ্যতা অযোগ্যতাকে ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন পরম ভক্তিমতী গোপীগণ ভগবানের প্রেমে বিহ্বল হয়ে ঘর-দ্বার, পতি-পুত্র, লোক-লজ্জা, মান-অপমান, ধর্ম ও ভয়—সব ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হয়ে গিয়েছিলেন। গোপীগণ কিন্তু জেনে বুঝে এ কাজ করেননি। ভগবানের

প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রেমই এর একমাত্র কারণ। এইজন্য ভগবান বলেছেন যে আমার প্রভাব কেবলমাত্র গোপীগণই জানে। এই ভাবের মধ্যে যতটা অংশ পরিমাণে ঘাটতি বা ত্রুটি থাকবে ততটাই প্রেমদানে বিলম্ব হবে। যে 'প্রেম-ভালোবাসা' চায় সেই তা পায়। বিনা চাওয়াতে জোরজবরদস্তি প্রেমদানের নিয়ম ভগবানের নয়। যদি এমনটি হত তাহলে এতদিনে সমস্ত জীবই মুক্ত হয়ে যেত। ভগবান অবতাররূপেও এমনটি করেন না। যদি করতেন তাহলে তাঁর সম্মুখেই তাঁর সমসাময়িক সমস্ত লোকই মুক্তি প্রাপ্ত হত। কেননা তিনি তো আর এ কথা বলতে পারেন না যে জোরজবরদস্তি প্রেমদানের সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু যেচে-পড়ে তাঁর মুক্তি প্রদান করার বিধান নেই। অবশ্যই ভক্তগণের মধ্যে এই বিশেষত্ব থাকে এবং ভক্তগণ নিজ নিজ সামার্থ্যানুসারে চেষ্টাও করে থাকেন। এই নিয়ম সেইসব মহাত্মাদের উপর প্রযোজ্য হয় যাঁরা সরাসরি জীবগণকে মুক্ত করার জন্য ভগবানের আদেশের অধিকারী অথবা কেবলমাত্র যাঁদের দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন ও ভাষণ দ্বারা জীবের কল্যাণ হয়। উদাহরণস্বরূপ ভক্ত প্রহ্লাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইজন্য ভগবানের চেয়েও ভক্তের অনেক বিশেষত্ব। শ্রীতুলসীদাসবাবাজী রামায়ণে (শ্রীরামচরিতমানসে) বলেছেন—

মোরেঁ মন প্রভু অস বিস্বাসা। রাম তে অধিক রাম কর দাসা॥
রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা॥

অর্থাৎ হে প্রভু! আমার মনে এই বিশ্বাস যে রাম হতে রামের দাস শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাম যদি হন গহন সমুদ্র, রামভক্ত হলেন অতি নির্মল শীতল জলধারা। হরি যদি হন চন্দন বৃক্ষ সম, তবে তাঁর ভক্ত হলেন নির্মল শীতল বায়ু।

অথবা কারক-পুরুষগণ এই নিয়মের অন্তর্গত। 'কারক পুরুষ' হলেন তাঁরাই যাঁরা ক্রমমুক্তির পথে ভগবানের পরমধামে পৌঁছে গেলেও তাঁর আদেশানুসারে কেবলমাত্র জীবোদ্ধারের জন্য সেই পরমধাম থেকে জগতে নেমে আসেন। যেমন ব্যাসদেব, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ। অতএব

ভগবানের জোর করে প্রেমদান করার নিয়ম নেই।

[৩৩]

অনুমান করছি ভজন-ধ্যান কম হওয়ার যে কারণ তুমি দেখিয়েছো সেটা ঠিকই। তবুও দৃঢ়তার সঙ্গে লেগে থাকলে সঞ্চিত কর্ম ও আলস্যও নাশ হয়ে যায়। এইজন্য সামর্থ্যানুসারে আরও বেশি করে পুরুষার্থ করা উচিত। তুমি লিখেছো, ভজন-ধ্যান ও সৎসঙ্গ করার চেষ্টা যতটা হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না—সে কথা ঠিকই। এটা হওয়ার জন্য পুরুষার্থই প্রধান কথা। তীব্রভাবে পুরুষার্থ (উদ্যম) করতে থাকলে যেমন যেমন সঞ্চিত পাপের নাশ হবে তেমন তেমন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হতে থাকবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে দৃঢ় বৈরাগ্য হয়ে শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ হয়।

ভগবানের প্রভাব, স্বভাব, গুণ ও লক্ষণের বিষয়ে আমি আর কী লিখবো ? যদিও এই বিষয়ে কিছু বলার কারো সামর্থ্য নেই তবুও নিজ নিজ বোধজ্ঞানানুসারে সংক্ষেপে নিজের ভাব ব্যক্ত করছি।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ (গীতা ৪।৬)
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৮)
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা ১৮।৬৬)

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই।

সাধুদিগের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য কর্মের আশ্রয় আমাতে ত্যাগ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপ একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, শোক কোরো না।

এই সব শ্লোকে ভগবানের প্রভাবের বিষয়ে বলা হয়েছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ হে অর্জুন ! যারা আমাকে যে ভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সেই রূপেই ভজনা করি। এই কথা জেনেই মানুষ সর্বতোভাবে আমার পন্থাকে অনুসরণ করে।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ (গীতা ৫।২৯)

অর্থাৎ প্রভাবসহ পরমেশ্বরকে জানলে শান্তি লাভ হয়। তিনি সকল প্রাণীর সুহৃদ, এই তত্ত্ব জেনে মানুষ শান্তি লাভ করে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীতা ১০।১০)

অর্থাৎ সেই সকল নিরন্তর আমার ধ্যানে মগ্ন প্রেমসহিত ভজনাকারী ভক্তগণকে আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি যার দ্বারা তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ (গীতা ১০।১১)

অর্থাৎ তাঁদের প্রতি (ভজনাকারীদের প্রতি) অনুগ্রহ করে আমি স্বয়ং অন্তঃকরণে একীভাবে স্থিত অজ্ঞান হতে উৎপন্ন অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ (আলো) দ্বারা নাশ করি।

এইসব শ্লোকে তাঁর স্বভাবের বিষয়ে লেখা হয়েছে। আর তাঁর অপার গুণ তো সীমাহীন।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥ (মনুস্মৃতি ৬।৯২)

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, অন্তর-বাহিরের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধৈর্য, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই দশটি হল ধর্মের লক্ষণ।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। (গীতা ১৬।৩)

অর্থাৎ তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য এবং অন্তর ও বাহিরের শুদ্ধি ও কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন না হওয়া, আপনাতে পূজ্যভাবের অভাব—হে কৌন্তেয়

এসব দৈবীসম্পদপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ।

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীক্ষমার্জবম্।
জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥

এইসব শ্লোকের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে আর এইগুলি সদ্‌গুণ বলে স্বীকৃত। পরমাত্মায় এ সমস্ত গুণ স্বাভাবিকভাবে থাকে। এই প্রকার আরও অপার গুণাবলী ভগবানে বর্তমান এবং সে সমস্তই তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণরূপেই আছে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ (গীতা ৮।৯)

অর্থাৎ যে পুরুষ সর্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, সকলের ধারক ও পোষক, অচিন্ত্য স্বরূপ, সূর্যের মতো নিত্য চেতন প্রকাশরূপ মোহান্ধকারের অতীত।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ (১২।৩)

যে পুরুষ মন-বুদ্ধির অগম্য, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস, অচল, নিত্য, নিরাকার, অবিনাশী পরম ব্রহ্মের উপসনা করেন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ (গীতা ১৩।১৫)

সকল ভূতের বাহিরে ও অন্তরে যিনি পরিপূর্ণ বিদ্যমান, চর ও অচররূপে তিনিই এবং সেই পরমাত্মা সূক্ষ্মের কারণে অবিজ্ঞেয় এবং অতি নিকটে ও দূরে তিনিই স্থিত আছেন।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎপীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

অর্থাৎ বংশীধারী, পীতাম্বর পরিধানে বিম্বফলের মতো যার অধরোষ্ঠ, সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, টানাটানা কমলাক্ষী সেই পরাৎপর কৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাতীত আমি আর কিছুই জানি না।

অতিশয় শান্ত, ভুজগশয়নশীল, পদ্মনাভ, সুরেশ (দেবগণেরও ঈশ্বর), বিশ্বের আধার, গগনসদৃশ, মেঘবর্ণ শুভ অঙ্গ যুক্ত।

তিনি লক্ষ্মীদেবীর পতি ও অগাধ গুণসম্পন্ন, কমলের ন্যায় নয়ন, যোগিগণের ধ্যানের অগম্য সেই ভবভয়হারী সর্বলোকের নাথ শ্রীবিষ্ণুর আমি বন্দনা করি।

এই শ্লোকগুলিতে ভগবানের সাকার ও নিরাকার স্বরূপের লক্ষণ কথিত হয়েছে।

এইরূপে আরও যতদূর পর্যন্ত অনুভূত হয় তাঁর প্রভাব অর্থাৎ তাঁর সামর্থ্য, স্বভাব সদ্গুণাবলী ও তাঁর স্বরূপকে স্মরণে রেখে তাঁর নামের জপ করা হলে তা বিশেষ লাভপ্রদ হয়। তুমি লিখেছো যে, তাঁর সামর্থ্য অর্থাৎ সম্যক্ প্রভাব অনুভব ব্যতীত নাম জপের সময় তাঁর স্বরূপ কী করে স্মরণে রাখা যাবে ?—তাই এই বিষয়ে কিছু লেখা হল।

[৩৪]

সংসারে বৈরাগ্য ও ভগবানে প্রেম খুব শীঘ্র যাতে হয় তার উপায় জানতে চেয়েছো। ভগবানের গুণানুবাদ, প্রভাব-রহস্য এবং প্রেমের কথা পড়লে ও শুনলে তথা নাম-জপ ও স্বরূপের ধ্যান করলে খুব শীঘ্র ভগবানে প্রেম উৎপন্ন হয় ও সংসারে বৈরাগ্য জন্মায়।

অমুকের ধ্যানের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো। আমার অনুমানে কার্যকালে গীতা ১৪নং অধ্যায়ের ১৯ নং শ্লোকসংখ্যা অনুযায়ী দ্রষ্টা সাক্ষীর ধ্যান হয়ে থাকে এবং একান্ত সময়ে সংসারের অভাব হয়ে সচ্চিদানন্দঘনের ভাব তথা অচিন্ত্য ধ্যানের বিশেষ চেষ্টা জাগে। কোনো সময়ে চিন্তা জাগলে শুধু আনন্দঘনরই চিন্তন হয়ে থাকে। আনন্দঘনকে বাদ দিয়ে অন্য চিন্তার স্ফুরণ কম হয়ে যায়। উত্থান অবস্থায় সংসারের স্ফুরণ তথা সংকল্প হয়ে থাকে তবে সেটি সংসারকে ভাবরূপে না রেখেই

হয়ে থাকে। তার কথা থেকে এই ধরনের অবস্থার অনুমান হয়।

মানসিক জপ সম্বন্ধে জানলাম। যে জপে মন বিশেষভাবে আপ্লুত থাকে তাকেই মানসিক জপ বলে। শ্বাসদ্বারা জপের চাইতে নাড়ীদ্বারা জপ, নাড়ীদ্বারা জপের চাইতে শুধু মানসে নামাক্ষর চিন্তন হলে এবং এর চাইতেও শুধু অর্থের (ভাবের) জ্ঞান মনে থাকলে মন অধিক নিমজ্জিত বলে মানা হয়। যত বেশি মন লাগে সাধনাও তত তীব্র হতে থাকে। কিন্তু শ্বাস এবং নাড়ীদ্বারা কৃত জপকেও 'কম' বলে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এরূপে নাম-জপের সংখ্যা অধিক হলে তা পরিণামে অতি উত্তম। উপরিউক্ত পথগুলির মধ্যে যে পথ তোমার সুগম (সহজ) বলে মনে হয় সেই পথই অবলম্বন করতে পারো। যে কোনো পথ ধরেই চলো না কেন বাস্তবে সেই সাধনা নিরন্তর হওয়াটাই বিশেষ জরুরি। যে সাধনা নিরন্তর বিশেষ সময় পর্যন্ত চলে এবং শ্রদ্ধাপূর্বক করা হয় তাকেই মহৎ বলে মনে করা হয়।

তুমি প্রশ্ন করেছো যে 'পরবৈরাগ্য' কীরূপে হয়। উপযুক্ত বিধি অনুসারে 'ভগবৎনাম জপ', তাঁর স্বরূপের চিন্তন (অর্থাৎ স্মরণ-মনন) সৎসঙ্গ ও তীব্র অভ্যাসের দ্বারাই তা সম্ভব। পরবৈরাগ্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপ হল পরমপুরুষ সেই পরমাত্মার জ্ঞান এবং তার ফলস্বরূপ পরম পুরুষ পরমাত্মার প্রাপ্তি। তুমি নিজ পুরুষার্থের ত্রুটির উল্লেখ করেছো—সেটা হওয়া উচিত নয়। কেননা এই ব্যাপারে পুরুষার্থই প্রধান কথা এবং যে পুরুষার্থহীন তার উপায় পরমাত্মাও করেন না। যদি করতেন তো এতদিনে করেই দিতেন।

তুমি লিখেছো যে তোমার সারাটা সময় কীভাবে নিরন্তর সাধনাতেই কাটবে—সে ভালো কথা। সংসারে বৈরাগ্য ও ভগবানে প্রেম থাকলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ধ্যান অমৃতরূপ হয়ে ওঠে না। ধ্যান যদি অমৃতরূপ মনে হয় তাহলে তো ধ্যানের তন্ত্রী কখনো ছিন্ন হতে পারে না। সর্বদা ভগবৎস্বরূপে দৃঢ় স্থিতি থাকলে পরমেশ্বরের স্বরূপে নিরন্তর স্থিত হওয়া (ডুবে থাকা) সম্ভব। যেমন যেমন ভগবানের অস্তিত্বে

বিশ্বাস দৃঢ় হবে তেমন তেমনই তাকে ভগবৎপ্রাপ্তির সন্নিকট বুঝতে হবে। বৈরাগ্যের প্রবলতার বৃদ্ধি হলে সব সময় অবিকল্প স্থিতি সম্ভব হতে পারে। এছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখি না। এইজন্য ভজন ও সৎসঙ্গের তীব্র অভ্যাসেরই চেষ্টা করা উচিত।

তুমি লিখেছো, স্বামী শ্রীস্বয়ংজ্যোতিজী মহারাজের দর্শনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় বলে বোধ হয়। কিন্তু একথাও ঠিক যে সব সময় একই ধরনের অবস্থার অনুভব হয় না। অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে কেবল স্বত্ত্বগুণের প্রাধান্য হলে—'একভূত' অবস্থা বিরাজ করতে পারে।

অন্তঃকরণে (হৃদয়ে) বৈরাগ্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো উপায় আছে কি না জানতে চেয়েছো। তার জন্য নাম-জপের সুতীব্র অভ্যাসের প্রয়োজন এবং ভক্তি ও বৈরাগ্য সংক্রান্ত শাস্ত্র (পুস্তকের) চর্চার অভ্যাসসহ সৎপুরুষগণের সঙ্গ করা উচিত।

তুমি আগে একবার লিখেছিলে যে বিনা আসক্তিতে যখন সংসারের কথা শোনা যায় তখন মাঝে মাঝে কথাও বলতে হয় ; সে বিষয়ে পরে মনের মধ্যে ওইসব ফালতু কথার স্ফুরণ ওঠে—এর জন্য কী উপায় ? একথা তো ঠিকই যে যার ফালতু কথায় আসক্তি নেই অর্থাৎ বৈরাগ্য হয়, সে তো সেসব কথা শোনেই না। যদি কখনো শোনে তো সে কথা মনে স্থান পায় না। এরজন্য আলাদা করে কোনো উপায়ের দরকার নেই।

সচ্চিদানন্দ ভগবানই সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সেই আনন্দঘনের অস্তিত্বের অনুভবও (জ্ঞান) সেই আনন্দময় ভগবানেই আছে। ভগবান সদাসর্বদা নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে আছেন। এইভাবে কখনো কখনো যা কিছু প্রত্যক্ষ প্রতীত হয় তাতে 'আমিত্বের' অভাবই প্রতীত হয়। 'আমি' কে তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সর্বদা এই ভাব বর্তমান থাকে না। তার জন্য তুমি উপায় জিজ্ঞাসা করেছো। 'আমিত্বের নাশ'ই হল এর উপায়। পূর্বোক্ত আনন্দঘনতে অবস্থানের সময় 'অহম্' বোধ হালকা অর্থাৎ 'কম' হয়ে যায়। 'অহম্' তখন সর্বব্যাপী সাক্ষী চেতনে প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি খুঁজলেও 'আমিত্বে'র সন্ধান না পাওয়া যায় তখন খোঁজকারীর

মধ্যে 'আমি'র ব্যাপকভাবে অবস্থান মানা হয়। যখন 'আমি'র অত্যন্ত অভাব হয় তখন আর তাকে খোঁজার ইচ্ছাও হয় না। তখন আর কোন্ প্রয়োজন 'আমি'কে কে খুঁজবে, কেনই বা খুঁজবে ? এই পত্রের বক্তব্য যদি কিছু তোমার বোধগম্য না হয়ে থাকে তাহলে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে নিও।

তোমার হৃষীকেশের সাধনার বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তুমি লিখেছো যে যৎকিঞ্চিৎ সাধনা যা হয়েছে সে তো আপনার সামনেই আছে, যদি লেখার যোগ্য কিছু হত তো লিখতাম। তোমার লেখা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে লিখেছো 'যা কিছু সাধনা হচ্ছে তা আপনার সামনেই রয়েছে'—একথা কী করে লিখলে ? আমি তো অন্তর্যামী নই।

তীব্র ধ্যান হওয়ার ফলে অমুকের জন্ম সফল হয়েছে, তুমি লিখেছো জানলাম। 'সফল' শব্দের তাৎপর্য ভগবৎপ্রাপ্তি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তি রূপ ফলের ইচ্ছা দোষযুক্ত নয়, তাই 'সফল' শব্দটি আমিও ব্যবহার করে থাকি।

তুমি লিখেছো অমুকের কুঠরি ও নদীর কিনারে যেরূপ ধ্যান হত তা হতে শ্রীযুক্ত ...... ধ্যান তীব্র। তার ধ্যানে নিরন্তরতাই বিশেষ প্রাধান্য পায়, না কিছু বিলক্ষণতা আছে ? (বিশেষ লক্ষণ) 'নিরন্তরতা' তো রয়েছেই, আরও কিছু বিলক্ষণতাও আছে। পত্রের মাধ্যমে যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে জানাবার ইচ্ছা আছে, তবে সাক্ষাতে বিশেষরূপে বর্ণনা করা সম্ভব।

যাকে সচ্চিদানন্দঘনের ধ্যান বলা হয়, তাই শ্রীসচ্চিদানন্দ ভগবানের স্বরূপ, যাঁর ধ্যান করা হয় তিনি অমৃতরূপ। সেই ক্ষণে ধ্যান সাক্ষাৎ অমৃতময় হয়ে যায়। কেবল অর্থমাত্র রয়ে যায়। আর ধ্যাতা (যিনি ধ্যান করেন), ধ্যান, ধ্যেয়রূপ—এই ত্রিপুটি থাকে না। অমৃতের জ্ঞান অমৃতস্বরূপ পরমাত্মারই কেবল হতে পারে, তবে আর অমৃতময় হওয়ার ইচ্ছা কার হবে ?

সাধনা করার বিষয়ে তুমি লিখেছো যে, তোমার পুরুষার্থ দ্বারা কিছুই হবে না। সেই পরমাত্মাই এক মাত্র সামর্থ্যবান। এখনও পর্যন্ত যা কিছু সাধন

হয় তাতে আমার কী পুরুষার্থ ? সে কথা ঠিকই। এরূপই মানা উচিত। কিন্তু পুরুষার্থ অর্থাৎ চেষ্টাপূর্বক সাধনা করে যাওয়া উচিত এবং একে প্রভুর প্রেরণা বলে মানা উচিত, যাতে কখনো 'অহং' ভাব না আসে। প্রভু তো সদা দয়াবান। যদি প্রভু বিনা পুরুষার্থে শুধু কৃপা করে উদ্ধার করে দেন তো সে তাঁর দয়া। কিন্তু বিনা চেষ্টায়, প্রযত্ন না করে কারোও ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। আপন পুরুষার্থ বলেই ভগবান প্রাপ্তি হয় এবং সেই পুরুষার্থ জাগে ভগবৎপ্রেরণা হতেই। সকলের উপরে ভগবানের কৃপা আছে, কিন্তু 'কৃপা' মানলে তবেই কৃপার বোধ হয়। শ্বাসদ্বারাও ভজনা হয়, তাতেও মন সঙ্গে থাকে কিন্তু মানসিক অর্থাৎ যা কেবল মন দ্বারা চিন্তিত হয়, সেই জপকে 'মানসিক জপ' বলতে হবে। শ্বাসদ্বারা জপও অতি উত্তম। এর দ্বারাও বাসনার অনেকাংশে নাশ হয়ে যায়। এঁর পরিণামও অতীব উত্তম।

[৩৫]

সর্বদা শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল হতে 'আমি'কে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই শরীর ইত্যাদি 'আমি' নয়। 'আমি' এর থেকে পৃথক। 'আমি' এর দ্রষ্টা।

তোমার স্বরূপ সেই 'সচ্চিদানন্দঘন'। তাঁতেই 'আমি' ভাব অর্পণ করা উচিত। আচার-ব্যবহারে ও কথা বলার সময়ও শরীরে 'আমিত্বে'র ভাব আরোপ করা উচিত নয়। বরাবর খেয়াল রাখতে হবে শরীরে 'আমি'র ভাব যাতে একদম না আসে। এই সাধনের পিছনে যুক্তিটি এইরকম যে দ্রষ্টা হয়ে শরীরকে লক্ষ্য করলে শরীর হতে 'আমিত্বে'র ভাব চলে যায়। কথা বলার সময় খেয়াল রেখে মাঝে মাঝে থেমে গেলে, এটি স্মরণে থাকে।

স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং সম্পূর্ণ বিষয়ভোগের মধ্যে সুখ নেই। যদি বাস্তবে এইসব দ্বারা সুখ পাওয়া যেত তবে তো দুঃখ থাকতই না। কিন্তু যদি এইসকল পদার্থ থাকা সত্ত্বেও দুঃখ হয় তাহলে তাতে যে সুখ নেই—এ কথা প্রমাণিত হয়। প্রকৃত সুখ হচ্ছে বিবেক-বিচারে, শান্তিতে এবং সন্তুষ্টিতে।

[৩৬]

তুমি প্রশ্ন করেছো সমস্ত লোকের যাতে অতি শীঘ্র উদ্ধার হয়ে যায়, সবাই ভগবানের প্রেমিক-ভক্ত হতে পারেন, তার জন্য অতি তৎপরতার সঙ্গে কী ধরনের পুরুষার্থ করা উচিত ? আমি এর উপায় কী বলবো ? ভগবানের পরমভক্ত প্রহ্লাদের মতো ভক্তজনই এর উপায় বলতে পারেন। যাঁর ধ্যানে, স্পর্শে ও যাঁর চর্চায় জীব ভগবানের পরমভক্ত হয়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে যায় তিনিই হলেন নিষ্কামী জ্ঞানী এবং ভক্তশিরোমণি। কিন্তু যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করেছো তাই নিজ বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেওয়া উচিত মনে করে কিছু লেখা হচ্ছে।

তুমি নিজের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছো, আমার মতে ওই উদ্দেশ্যই উত্তম উপায়। ভক্তগণের উদ্দেশ্য এরূপই হওয়া উচিত। আমার বুদ্ধিতে এই অসার সংসারে ভগবৎনাম জপই প্রেম, ভক্তিই বোধের শ্রেষ্ঠ উপায়। মনুষ্যজন্ম লাভ করেও যিনি ভগবৎভক্তির জন্য চেষ্টা করেন না, তাঁকে ধিক্কার জানাই। লোকেদের ভগবানের ভজন, ধ্যান, কীর্তনে নিয়োজিত করাই পরম কর্তব্য—জীবনের উদ্দেশ্য এটাই। যে এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য নিজের জীবন সমর্পণ করে সে ধন্যবাদের পাত্র। যে নিজের শরীর, মন, অর্থ প্রভৃতি সর্বস্বকে সংসারের লোকেদের ভগবান ভক্তিতে সংলগ্ন করার জন্য নির্দিষ্ট মনে করে, তাকে আর সেগুলি অর্পণ করতে হয় না, তার সর্বস্বই ভগবানের এবং সেগুলি সেই কাজেই লেগে থাকে। লোকেদের ভগবৎভক্তিতে নিয়োজিত করার জন্য সে নিজ শরীরের চামড়া দিতেও দ্বিধা করে না। তার জীবন মানুষের উদ্ধারের জন্যই। সে ভক্তির প্রচারের জন্য প্রসন্নতাপূর্বক নিজ প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিয়ে থাকে।

[৩৭]

তোমার স্ত্রী ও ঘরের অন্যান্য সদস্যগণ তোমার উপর বিশেষ প্রসন্ন নন, এই কারণে তোমার তাঁদের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। আমার তো স্বভাব সকলের সঙ্গেই প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করা। যাতে ঘরের লোক আরামে থাকে ও তাদের মন খুশি থাকে, তেমনই ন্যায়পূর্ণ ব্যবহার

করা আমার মতে উত্তম। নিজের শরীরকে ঘর ও সংসারের সমস্ত মানুষের সেবায় লাগিয়ে দেওয়া উচিত।

সৎসঙ্গের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত। সৎসঙ্গের প্রভাবে নীচু ব্যক্তিও শুধরে যায়। ভগবৎভক্তি এমন এক অসামান্য উত্তম বস্তু যে তার সমতুল্য আর কিছুই নেই।

যে ব্যক্তি ভগবানের গুণকীর্তন করতে থাকে সেই ধন্যবাদের যোগ্য। একমাত্র ভগবৎকৃপাতেই ভগবদ্চর্চা সম্ভব।

[৩৮]

তুমি লিখেছো যে 'যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই মোহজালে আবদ্ধ সে নিজে নিজে কী করে তার থেকে ছাড়া পাবে।' এইজন্য যে ভাবেই হোক আপনারই তাকে মুক্ত করা উচিত। মোহজাল হতে বার করার কর্তা হলেন একমাত্র ভগবান। নিম্নলিখিত শ্লোকানুসারে সেই পরমেশ্বরের শরণ নেওয়া উচিত—এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(গীতা ১৮।৬২)

'হে ভারত ! সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরের অনন্য শরণ গ্রহণ করো, পরমাত্মার কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত হবে।'

এই শরণের জন্য সৎসঙ্গ করা চাই। সৎসঙ্গের মর্ম একবার বুঝতে পারলে সৎসঙ্গের বিয়োগ যে কী ক্ষতিকর তা বোঝা যায়। সৎসঙ্গের সমান আর কিছুই নেই। সংসারের বিষয় ভোগ তখন ভালো লাগে না। সৎসঙ্গ করার সময় বড় আনন্দ হয়। অশ্রুপাত হয়ে থাকে এবং বারংবার রোমাঞ্চ হয়। যতক্ষণ না এমন অবস্থা হয়, ততক্ষণ বুঝবে যে বাস্তবে সৎসঙ্গ লাভ হয়নি এবং তার মর্মও উপলব্ধি হয়নি।

[৩৯]

আমার মনে হয় তোমার পরিবারের লোক যাতে তোমায় ভালোবাসে তোমার এমন চেষ্টাই করা উচিত। আসক্ত না হয়েও ভালো করেই দোকান

চালানোর উপায় আগে লিখেছিলাম। সেইরূপ করার চেষ্টা করা উচিত। তুমি প্রশ্ন করেছো যে ভগবানের ভজনে কীরূপে ভালোবাসা জন্মায়—সেটা ভগবানের ভজনের প্রভাব জানলে তথা তাঁতে শ্রদ্ধা হলে প্রেম জন্মায়। যাঁর ভগবানে শ্রদ্ধা আছে, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করলেও শ্রদ্ধা বাড়ে। ভজনকারীর সঙ্গ করলে ভজন-ধ্যান অধিক পরিমাণে হয় ও প্রেমী-ভক্তের সঙ্গ করলে তথা তাঁর লিখিত কথাগুলি পড়লে, ভগবানের এবং তাঁর ভজনায় ভালোবাসা উৎপন্ন হয়। যদি কোনো বস্তুর আবশ্যকতা হয় তাহলে সেই বস্তু যার কাছে আছে তাঁর এবং সেই বস্তুর সঙ্গ করলে সেই বস্তুতে প্রেম-ভালোবাসা জন্মায় অর্থাৎ তার প্রাপ্তি ঘটে।

যদি মানুষ ভালোবাসা নিয়ে ও প্রচণ্ড (উৎকট) ইচ্ছা নিয়ে কারো সঙ্গ করে তাহলে তার ভাবও তদনুসারেই হয়ে থাকে, এবং ভজনাপূর্বক সাংসারিক কাজ যতটা সম্ভব ততটা করার চেষ্টা অবশ্যই রাখতে হবে।

[৪০]

তুমি লিখেছো যে 'পরমাত্মা ও গুরুদেবের জয়গান যে করে সেই ধন্যবাদের পাত্র।' পরমাত্মা ও গুরুদেবের কথনে শ্রদ্ধা হলে যেমনই পাপী হোক না কেন, তার কল্যাণ হয়ে যায়। তোমার লেখা খুবই যুক্তিযুক্ত। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ার পরে আর কোনো কিছুই বাকি থাকে না। পরমাত্মাদেবের এবং গুরুদেবের উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হওয়ার পরে তাঁরা আরও বহু মানুষের কল্যাণ করার যোগ্য হয়ে ওঠেন।

তুমি লিখেছো যাতে পরমাত্মায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়ে কল্যাণ হয় তার উপায় করার জন্য, সে তো ভালো কথা। এমন হওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। যদি উপায় চাও তো উপায় হবে। ভগবানের দিক থেকে তো কোনো দেরি নেই। যে মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের উপায় খুঁজছে, সে যে কোনো উপায়েই তাঁর পরায়ণ হয়ে যাবে। তখন সে ভগবানের সমতুল্য আর কিছুই বোধ করবে না। এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে উপায় বের করা কিছুই কঠিন নয়।

তুমি লিখেছো যে 'ঈশ্বরে তোমার শ্রদ্ধা হওয়া চাই'—সে তো

ভালোকথা, যদি 'শ্রদ্ধা' চাও তো ভগবানে সর্বস্ব অর্পণ করলে হতে পারে ; আর যদি না চাও তো এই ধরনের কথা লেখা উচিত নয়।

তুমি এক জায়গায় লিখেছো যে 'আমি তো শ্রীগুরুদেবের সভায় একজন এক অতি ক্ষুদ্র সাধনাকারী', আবার অন্য জায়গায় লিখেছো যে তোমার কিছুই সাধনা হয় না—এই দুরকম কথার অর্থ কী ? এবং গুরুদেবের সভা কোনটি যেখানে তুমি অতি ক্ষুদ্র সাধনাকারী ? সাধনা যদি ছোটও হয় তাহলেও উত্তম। ছোট সাধনা হতেই বড় সাধনায় উত্তরণ হয়।

তুমি লিখেছো যে 'আমার সাধন-ভজনের ভরসায় উদ্ধার হওয়া কঠিন। যদি কোনো অতি নীচ ব্যক্তিও মহান্ পুরুষের নিকট যায়, তিনি তাকে স্বীকার করেন—এমন যদি হয় তাহলেই আমার উদ্ধার সম্ভব'—ঠিক কথা। মহাত্মা ব্যক্তি তো সদাই দয়ালু হন। তাঁর দর্শনেই উদ্ধার তথা কল্যাণ হয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর সমীপে থাকলে তো কথাই আলাদা। সত্যিকারের মহাত্মা দূর্লভ। তবে তাঁর দর্শন হলে তো খুবই আনন্দের কথা। মহাত্মার শরণ (আশ্রয়) নেওয়ার পরে তো আর ভজন-ধ্যানে কোনো বাধা থাকে না এবং স্বভাবও আপনা আপনিই শোধন হয়ে যায়।

[৪১]

তোমার ধ্যান কেমন হচ্ছে ? সর্বদা সচ্চিদানন্দঘনে এরূপ ধ্যানে মগ্ন থাকবে। 'আমিত্বে'র সম্পূর্ণ নাশ হতে হবে এবং নিজ শরীর ও এই সংসারকে আনন্দময় কল্পনা করে, তাকে মিথ্যা জেনে তার সংকল্প ত্যাগ করা উচিত। শরীরের হুঁশজ্ঞান যেন না থাকে।

জব ম্যায় থা তব হরি নহীঁ, অব হরি হ্যায় ম্যায় নাহীঁ।
কবিরা নগরী একমেঁ, রাজা দো ন সমাহিঁ॥

অর্থাৎ যখন 'আমি' ছিলাম 'হরি' ছিলেন না, এখন 'হরি' অবস্থান করছেন, 'আমি' চলে গেছে। একটি নগরীতে দুটি রাজা কখনো একসঙ্গে অবস্থান করেন না।

যা কিছু আছে, সবই সেই সচ্চিদানন্দঘন—এইরূপ চিন্তা ছেড়ে দিয়ে

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাংসারিক বস্তুসমূহের চিন্তায় নিজের মন দেয় সে ব্যক্তি মহা মূর্খ। বিনাশশীল মিথ্যা বস্তুসমূহের ভাবনা কেন করবে ?

যে পূর্ণ আনন্দ হৃদয়ে ধরে না, সেই আনন্দের সর্বদা ধ্যান করলে ধ্যাতা (ধ্যানকারী) স্বয়ং সেই আনন্দস্বরূপ হয়ে যান। 'আমিত্বে'র সম্পূর্ণ নাশ হলে একমাত্র সচ্চিদানন্দই অবস্থান করেন।

ম্যায় জানা ম্যায় ঔর থা, ম্যায় তো ভয়া অব সোয়।
'ম্যায়' 'তৈ' দোনো মিট গঈ, রহী কহনকী দোয়॥

অর্থাৎ আমি এতদিন জানতাম 'আমি' অন্য কিছু। কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করেছি যে আমি সেই স্বরূপই। 'আমি' এবং 'তুমি' এই দুই-ই লোপ হয়ে গেছে, শুধু বলার জন্য দুটি প্রতীত হচ্ছে।

[৪২]

তোমার কী অসুখ আছে সেকথা লেখা উচিত ছিল। তুমি লিখেছো যে ঈশ্বর দশ-বিশ দিনেই ভালো করে দেবেন—কিন্তু ভগবানের নিকট এই তুচ্ছ শরীরের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। কারণ এটি সকাম ভক্তির নিদর্শন। যদি কিছু চাইতেই হয় ভগবানের কাছে, তাহলে তাঁর দর্শনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত অথবা এমন কিছু চাওয়া উচিত যা পেয়ে গেলে আর কখনো কোনো বস্তু চাইবার প্রয়োজন হয় না। শরীর, স্ত্রী, পুত্র ও টাকাকড়ির জন্য এত উচ্চ পর্যায়ের মালিকের কাছে আর্জি পেশ করা উচিত নয়। তুচ্ছ মিথ্যা শরীর ও তার ভোগ তো এই পৃথিবীতে রয়ে যাবে। মহাত্মা ব্যক্তিগণ বলে থাকেন যে 'মরে যাবো তাও ভালো। তবু নিজের জন্য ভগবানের কাছে কখনো কিছু চাইবো না।'

মর জায়ুঁ মাঁগু নহীঁ, অপনে তনকে কাজ।
পরমারথকে কারণে, মোহিঁ ন আবৈ লাজ॥

পরমার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে চাওয়ায় কোনো আপত্তি নেই, নিজের শরীরের জন্য ওই স্বামীর (প্রভুর) কাছে কিছু প্রার্থনা করা খুব ছোট ব্যাপার।

নামের জপ হলে ধ্যানও নিজে থেকেই হয়ে থাকে। রামনামের এই

পুঁজিই (মূলধনই) তো আসল ধন, তাকে মিথ্যা কাজে লাগাতে নেই।

বলা হয়ে থাকে—

কবিরা সব জগ নিরধনা, ধনবন্তা নহী কোয়।
ধনবন্তা সো জানিয়ে, (জাকে) রামনাম ধন হোয়॥

রামনাম অমূল্য রত্ন সমান। তাকে শারীরিক আরামদেয় সংসারের ভোগরূপী বস্তুর প্রাপ্তির জন্য খরচ করা উচিত নয়। মিথ্যা বস্তু ভগবানের কাছে কামনা করা উচিত নয়।

[৪৩]

নাম জপকালীন সর্বদা 'আমি নই' 'আমি নই'—এই অভ্যাস (মনে) ধারণ করা উচিত। শরীর হতে 'আমি' ভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ হতে হবে, না হলে পরে মুশকিল হবে।

'ম্যায়' 'ম্যায়' বড়ী বলায় হ্যায়, সকো তো নিকসো ভাগ।
কব লগ রাখো রামজী, রুই লপেটী আগ॥

অর্থাৎ এই 'আমি' 'আমি'—এটিই মূল রোগ। পারলে এর থেকে মুক্ত হও, তুলোতে আগুন ধরলে সেটি ভস্ম হতে কতক্ষণ ?

এই শরীর মিথ্যা এবং বিনাশশীল। তুলো দিয়ে চাপা আগুন কতক্ষণ দমে থাকবে ? শীঘ্রই এ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। এই মিথ্যা শরীরে যে আমিত্বের ভাব আরোপিত হয়ে রয়েছে তা দূর করতে বেশি দেরি করা উচিত নয়। সংসারে বহু লোক 'আমি' ও 'আমার' এই ভাবের বাঁধনে বাঁধা আছে, কিন্তু যার ভগবানের আশ্রয় তার কোনো বন্ধন নেই।

মোর তোরকী জেবরী, গল বাঁধী সংসার।
দাস কবীরা ক্যোঁ বঁধে, (যাকে) রাম নাম আধার॥

অর্থাৎ 'আমার' 'তোমার' এই ভাবের রশ্মিতে সংসারের সকলেই বাঁধা রয়েছেন। কিন্তু যে রামনামের আশ্রয় নিয়েছে সে কেন বাঁধা পড়বে ? বন্ধন হলেও তা ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং সেই পরমাত্মার আশ্রয় এমনভাবে নেওয়া উচিত—'যা কিছু আছে সবই সেই ভগবান'। সেই মালিককে

প্রাণের থেকেও বেশি মান্য করা উচিত।

তাঁর গুণকীর্তন তথা প্রভাব শুনলে প্রেম বৃদ্ধি হয়। সৎসঙ্গে তাঁর প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হয়, সেইজন্য সৎসঙ্গ করা উচিত। শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। হরিকথায় হরির প্রতি ভাব বৃদ্ধি হয়। ভাব বর্ধিত হলে দর্শনের ইচ্ছা বেড়ে যায়। ইচ্ছা বৃদ্ধি হলেই ভজনা বেশি পরিমাণে হয়। ভজনায় নিষ্কাম প্রেম উৎপন্ন হয়ে ভগবানের দর্শন হয়। মহাত্মা তথা ভক্তগণ সেই কথাই বলে থাকেন।

তুমি লিখেছো যে 'সাংসারিক আসক্তির জন্য তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে'—আসক্তি তো খারাপ জিনিসই। আন্তরিক প্রীতি-ভালোবাসা কম থাকাও ছাড়াছাড়ি হবার একটি কারণ বলে মনে হয়।

ভাই ! নাম-জপ, সৎসঙ্গ, ভগবানের ধ্যান এবং ভাবসহিত স্মরণ—নিষ্কামভাবে করে ভগবানে প্রেম বর্ধিত করা উচিত। যদি আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কমও হয় তাতেও ক্ষতি নেই। প্রেমাস্পদে প্রেম চাই, প্রেমই প্রধান কথা। ঈশ্বরে প্রেম না হলে দেখা-সাক্ষাতের বিশেষ মূল্য নেই।

[৪৪]

সংসারে থেকে শুদ্ধ হৃদয়ে কর্ম করা যায় তো খুবই ভালোভাবে জীবন-নির্বাহ হবে। চতুর ব্যক্তির সঙ্গে চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারে আপত্তি নেই। ছল কপট ব্যবহারেই আপত্তি। কিন্তু হৃদয় শুদ্ধ নাহলে ব্যবহার শুদ্ধ হওয়া খুবই শক্ত। ভজনধ্যান করতে করতে সংসারের কার্য করতে থাকলে পাপের বিনাশ হয়ে যখন হৃদয় শুদ্ধ হয় তখন কোনো বাধা আসে না। যখন অর্থের লোভই দূর হয়ে যাবে তখন আর ছল-চাতুরির ব্যবহার কেন হবে ?

স্বার্থত্যাগ করলেই ব্যবহার শুদ্ধ হয়, কিন্তু ব্যবহার (ব্যবসা, কাজকর্ম) অধিক করা ঠিক নয়। সাধনা যখন খুব তীব্র হয়ে যায় তারপর অধিক কাজকর্মে কিছু হানি হয় না কিন্তু প্রথমে শক্তি যথেষ্ট না সংগ্রহ করে অধিক কর্ম করা উচিত নয়। ভজন ধ্যান করার সাথে সাথে যতটা কাজ-করা সম্ভব ততটাই করা উচিত।

তুমি লিখেছো যে 'ভগবদ্‌গীতায় ভগবান অর্জুনকে এবং যোগবাশিষ্টতে শ্রীবশিষ্ট ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন—একথা ঠিক নয়। যদি গৃহস্থ ধর্ম ছাড়ার কথা বলা হত তাহলে তো অর্জুন এবং রামচন্দ্র গৃহস্থাশ্রম ছেড়েই দিতেন। অর্জুন তো গৃহস্থধর্ম ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ভগবান তাঁকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন।

ভগবান বলছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ।

অর্থাৎ 'তুমি সর্বদা নিরন্তর আমাকে স্মরণে রেখে যুদ্ধ করো।'

অন্যান্য স্থানেও ভগবান এরূপ কথাই বলেছেন 'নিষ্কামভাবে কর্ম করে সংসারে অবস্থান করো', 'আমাকে স্মরণে রেখে, মন বুদ্ধি আমায় সমর্পণ করে, স্বার্থ ত্যাগ করে সংসারে কর্তব্য কর্ম করো, আমার কৃপায় তুমি উদ্ধার হয়ে যাবে।' গৃহস্থধর্ম ছাড়ার কথা কখনো কোথাও বলেননি।

তুমি লিখেছো যে 'আমার কুসঙ্গ নেই'—সে তো আমারও জানা আছে যে তোমার খুব খারাপ সঙ্গ নেই। কিন্তু সংসার, সংসারের সর্ববস্তুসমূহ, ভোগ—ধন ও সাংসারিক সুখদায়ক বস্তুসমূহের আসক্তিপূর্বক যে চিন্তন, সেসব কুসঙ্গেরই নামান্তর। একমাত্র ঈশ্বরের ভজনা, ধ্যান ও সৎসঙ্গ ব্যতীত আর সবই 'কুসঙ্গ'।

তুমি লিখেছো যে 'সুগ্রীব, উদ্ধব ও অর্জুনকে মিত্র বানিয়ে ভগবান তাঁদের উপর অনেক কৃপা করেছেন। তাঁদের মতো আর কারো পরে ভগবান এত কৃপা করেননি, কিন্তু এত হওয়া সত্ত্বেও সুগ্রীব, উদ্ধব ও অর্জুনের জ্ঞান হয়নি।'—তোমার এ বোঝা ভুল। আমি তো মনে করি ওই সব ব্যক্তিগণের জ্ঞান অবশ্যই হয়েছিল। তাঁদের নিজেদের উদ্ধারে তো কোনো সন্দেহই নেই বরং ভগবানের ভক্ত ও সখাগণের কৃপাও যাঁর উপর হয়, তাঁরও জ্ঞান লাভ হয়ে যায় এবং তিনি এই অসার সংসার জগত হতে মুক্ত হন।

ভগবৎ নাম-জপ, প্রেমভক্তি তথা ভগবৎকৃপায় মানুষ উদ্ধার হয়ে

যায়। স্বয়ং ভগবান তাঁকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। ভগবান বলেছেন—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

(গীতা ১০।৯-১০)

যাঁরা নিরন্তর আমাতেই মনঃসংযোগ করে থাকেন, আমাতেই প্রাণ অর্পণ করে থাকেন, সর্বদাই আমার ভক্তির চর্চাদ্বারা পরস্পর আমার প্রভাবকে জানেন এবং গুণ ও প্রভাবের সহিত আমার কীর্তন করে সন্তুষ্ট হন ও বাসুদেবরূপ আমাতেই নিরন্তর রমণ করেন, সেই নিরন্তর আমাকে চিন্তাকারী ও প্রেমসহিত ভজনাকারী ভক্তগণকে আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ 'যোগ প্রদান করি যাতে তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন'।

তুমি লিখেছো 'কোন কৃপাদ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়।' নিম্নলিখিত শ্লোকানুসারে ভগবানের আশ্রয় (শরণ) গ্রহণ করলে পূর্ণরূপে কৃপার অনুভব হওয়া সম্ভব।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎপরাংশান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্॥

(গীতা ১৮।৬২)

'হে ভারত ! সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরেরই অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ করো, সেই পরমাত্মার কৃপাতেই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত হবে।'

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

'সব ধর্মকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করে কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারূপ আমারই অনন্যভাবে শরণ নাও, আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করবো, তুমি শোক কোরো না।'

ভগবানকে সর্বদা চিন্তন করলে এরূপ শরণ লাভ সম্ভব এবং এরূপে ভগবৎকৃপায় জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ হয়। ভগবানের এই কৃপাতেই ভগবান মেলে ও জীবের উদ্ধার হয়। এইসব কথাগুলি খুব ভালো করে বোঝা উচিত।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছো যে 'আমার সংসারে থেকে কী করা উচিত ?' এর উত্তর তো উপরেই দিয়েছি। ভগবানের গুণকীর্তন, প্রভাব ও প্রেমের কথা পড়া ও শোনা প্রয়োজন। সর্বদা ভগবৎ নামের জপ ও স্বরূপের ধ্যান করতে থেকে আসক্তি ও স্বার্থ ত্যাগ করে সংসারের কাজ কর্ম করা উচিত। আসক্তি যদি দূর না হয় তো কোনো চিন্তা নেই, সবকিছু ভগবানের মনে করে যেমন ভৃত্য মালিকের জন্য কাজ করে তেমনই নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে সংসারের সমস্ত কর্ম ভগবানের জন্যই করা উচিত।

তুমি লিখেছো যে 'প্রার্থী মনে করে সদাব্রতের উপদেশ আমাকেও দেওয়া উচিত।' তা আমি উপদেশ দেওয়ার কে, কিন্তু তোমার আদেশ শিরোধার্য করে আমার বোধমতো শাস্ত্রের কিছু কথা (তোমায়) লিখেছি।

তুমি লিখেছো যে 'সংসার তো দুঃখে পরিপূর্ণ'—হ্যাঁ সে কথা ঠিকই। সংসারে কোনো সুখই নেই। যা কিছু সুখ বলে মনে হয় সেসব মিথ্যা ভাসমান (উদ্ভাসিত)। অন্তিমে দুঃখই দুঃখ।

তোমার চিঠিতে মহারাজা দশরথ ও বসুদেবের বিষয়ে পড়লাম। সেই সব ব্যক্তিগণ ধন্য যাঁদের ঘরে স্বয়ং ভগবান অবতার রূপে জন্মেছেন। দেখতে গেলে সেই সব লোকেরও অনেক সাংসারিক দুঃখ এসেছে, কিন্তু অন্তিমে তাঁরা সংসার থেকে উদ্ধার হয়েছেন। আমার মনে হয় তাঁদের আর পুনর্জন্ম হবে না। তাঁদের উদ্ধার সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের ক্ষেত্রেও কিছু সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ এসেছে তা ঠিকই। পূর্বকৃত পাপেরও হয়তো কিছু বাকি ছিল, যা ভোগ করে তাঁরা শুদ্ধ হয়েছেন এবং ভগবান তাঁদের ঘরে জন্ম নেওয়ায়, তাঁদের উদ্ধার হয়ে গেছে। তাঁরা পুণ্যাত্মাও ছিলেন। সকলেরই পাপ-পুণ্য থাকে, কারো পাপ বেশি থাকে তো কারো পুণ্য বেশি।

দশরথ ও বসুদেব পূর্বজন্মে ভগবানের বড় ভক্ত ছিলেন। হতে পারে পূর্বের জন্মের কোনো পাপ ছিল, সেই সব পাপের ভোগান্তে, ভক্তির মহিমায় পাপের নাশান্তে তাঁদের এই সংসার সাগর হতে উদ্ধার হয়েছিল।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছো যে, 'সংসারে জীব তো সুখের মুখ দেখতে পায় না। তবুও এই জীব কেন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সংসারে বিচরণ করে ?' তারা মূর্খতা অর্থাৎ অজ্ঞানতার কারণে ঘুরে মরে। এরা ভুলবশত সংসারকে সুখের হেতু মনে করে ; মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় সংসারে মিথ্যা সুখ উদ্ভাসিত হয় ; এই কারণে এই মূর্খতায় ফেঁসে মৃগের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ছুটতে থাকে।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছো যে 'এই জীব কী করে সুখ পাবে ?'—ভগবানের প্রতি ভক্তিতেই সুখ হয়, কারণ ভক্তিতেই সুখ নিহিত। ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়, যার দ্বারা চিরকালীন পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তি হয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নং থেকে ৩২ নং শ্লোকের অর্থ জানা উচিত। সেই অনুসারে ভজন-ধ্যান করলে অপার সুখ প্রাপ্তি হয়। তারপর কোনোদিনও দুঃখবোধ হয় না। এমন আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে যার সমতুল্য তো অন্য কোনো আনন্দ হয়ই না, এবং তার কখনো শেষ হয় না।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছো যে 'সংসারে থেকে কী প্রকার আচরণ করা উচিত ?'—ঠিক আছে। নিজের থেকে বয়স্কগণের প্রতি শ্রদ্ধা, সমবয়সীগণের সঙ্গে মিত্রতা (বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার), ছোটদের প্রতি পালকের ভূমিকা পালন করে সবারই সেবা করা উচিত।

[৪৫]

আমি শুনেছি যে হিন্দু-মুসলমান বিষয় নিয়ে তুমি খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত আছো। আমার মনে হয় এটা খুব লজ্জার কথা। পরোপকারে জীবন ব্যয় করা অতি উত্তম,—এর জন্য আনন্দ করা উচিত। যাঁরা লোকসেবা করেন, তাঁদের উপর অনেক বড় বড় বাধা-বিপত্তি আসে ; এর জন্য তাঁরা কখনো শোক করেন না। এতে ঘাবড়াবার কী আছে ? যদি

তুমি লোকহিতার্থে ন্যায়পূর্বক কিছু চেষ্টা করো ও সেইজন্য তোমার উপর বিপত্তি আসে—তাহলে তো তোমার আনন্দ করা উচিত।

যদি তুমি নির্দোষ হও তাহলে এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে তোমার কোনো লোকসান হতে পারে না। কিন্তু যদি দোষী হও, তাহলে দণ্ড ভোগ করার জন্য আনন্দের সঙ্গে তৈরি থাকা উচিত এবং তুমি যদি মনে করো যে লোকহিতে কাজ করার জন্য বিনা দোষেই তোমার উপর বিপত্তি আসছে ; তাহলে একজন বীরের ন্যায় তোমার জেলে যাওয়া উচিত, অথবা তোমার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা উচিত। কান্নাকাটি করা, চিন্তা করা বা লুকিয়ে থাকা তো কাপুরুষের লক্ষণ, কাপুরুষতা খুব খারাপ জিনিস। গীতার ২য় অধ্যায়ের ২নং ও ৩নং শ্লোকের অর্থ জেনে কাপুরুষতা ত্যাগ করা উচিত। এখানে বীরতাই মুক্তির কারণ। কাপুরুষতাপূর্ণ জীবন তো মৃত্যুর সমান, শূরতা অর্থাৎ বীরতার সঙ্গে প্রাণত্যাগ করা লাভজনক ও ধর্মময়। গীতার ২য় অধ্যায়ের ৩৭, ৩৮ ও ৩য় অধ্যায়ের ৩৫ নং শ্লোকের অর্থ দেখ। তুমি যখন এখানকার মামুলী বাধায় এতটা ঘাবড়াচ্ছ তবে সেই মৃত্যুর অধিকর্তা যমরাজের বার্তা পেলে তো না জানি তোমার কী অবস্থা হবে ? তোমার তো সেই ওয়ারেন্টেও ভয় পাওয়া উচিত নয়। শরীর তো একদিন যাবেই, তবু যদি কোনো ভালো কাজ করতে করতে যায় তো খুবই ভালো কথা। কারাগারের কথা স্বতন্ত্র, পরোপকার করতে গিয়ে যদি ফাঁসীতে লটকাতে হয় তাহলেও আনন্দের কথা। ভীরুতাবশে কিছুদিন বেঁচে থেকেইও বা কী লাভ ?

তুমি কি এতে তোমার অপমান মনে করো ? ভীরুতা, কাপুরুষতাই অপমান, বীরত্বে অপমান নেই। ধর্মের ত্যাগে অপমান, ধর্মরক্ষায় অপমান নেই। আর কিছু যদি করতে না পারো তবে মালিকের যা মর্জী তাতেই প্রসন্ন থাকা উচিত। বিচারের দ্বারাই হোক অথবা জেদের বশেই হোক, শোক চিন্তা ও দুঃখসমূহকে দূরে রেখে সর্বদা সব অবস্থাতে আনন্দমগ্ন থাকা উচিত। ভজনধ্যানের জন্য নিরন্তর চেষ্টার সহিত একথায় বিশ্বাস রাখা উচিত যে, যা কিছু হয় সব ভগবানের দয়াতে হয় এবং

তাতেই মঙ্গল।[১]

[৪৬]

তুমি লিখেছো যে 'ইদানীংকালে ভজন, ধ্যান ও সৎসঙ্গ আমার দ্বারা হচ্ছে না'—কিন্তু ভজন, ধ্যানাদি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সমস্যা বড় কঠিন।

দ্রব্যোপার্জনের জন্য ব্যবসা করায় তো তোমার পরিশ্রম হয়, কিন্তু সত্যিকারের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা হয় না। এর থেকে বোঝা যায় যে তুমি ভজন, ধ্যান ও সৎসঙ্গকে ধনরত্নের সমানও মনে করো না। তোমার বিবেকপূর্বক ভেবে দেখা উচিত যে এই নশ্বর দ্রব্য কি মৃত্যুর সময় তোমার সহায়তা করতে পারবে ? কোন দ্রব্য তোমাকে ভগবৎসম্বন্ধিত আনন্দ দিতে পারবে ? এরূপ কখনো হবে না, কারণ সেখানে কোনো ঘুষ নেওয়ার লোক নেই। পরলোকের কথা তো দূর, ধনদ্বারা এই লোকেও বাস্তবিক কোনো সুখ পাওয়া যায় না। সংসারে যারা মূর্খ তারাই এতে সুখ মনে করে, বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণের জন্য তো সাংসারিক সুখ দুঃখ-স্বরূপই হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—**'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈ-র্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।'**

বাস্তবিক যদি সংসারে সুখ লাভ হত, তাহলে ঋষি-মুনিগণ সাংসারিক সুখসমূহ ত্যাগ করে কেন বনে গিয়ে তপস্যা করতেন ? তোমার যদি নিজের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে তো নিষ্কামভাবে প্রেমপূর্বক পরমাত্মার পুণ্য নামের জপ করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত। সেই বাস্তবিক প্রকৃত নিষ্কাম পরমপ্রিয় পরমাত্মার প্রেমে কলঙ্ক লাগানো উচিত নয়।

যে ব্যক্তি এই অসার সংসারের তুচ্ছ, অনিত্য এবং ক্ষণভঙ্গুর ভোগের ফাঁসে ফেঁসে ভগবৎভজন, ধ্যান, সৎসঙ্গ ছেড়ে দেয় সে মহামূর্খ। অন্তিমে তার বড় দুর্দশা হয়। অতএব অধোগতি প্রাপ্ত করায় এমন কার্য ভুলেও করা

[১]কোনো এক মামলায় জড়িয়ে পড়া জনৈক চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কয়েক বছর আগে এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল।

উচিত নয়।

তোমার কল্যাণোপযোগী কার্যে যে ব্যক্তি তোমায় সহায়তা করে, তাকেই তোমার পরম মিত্র জেনে বাকি সবাইকে নকল বন্ধু জানবে। আর বিশেষ কী লিখবো, যদি তোমার নিজের কল্যাণের ইচ্ছা হয় তো বিচার না করে শীঘ্র সতর্ক হও এবং সাংসারিক মোহজালে আবদ্ধ না হয়ে তীব্র সাধনার জন্য তৈরি হও।

[৪৭]

পরমাত্মার ভজন-ধ্যান বজায় রেখেই সাংসারিক কার্যের জন্য চেষ্টা করা উচিত। অন্য কাজে ভুল হলেও, পরমাত্মার ভজন-ধ্যানের কথা ভোলা উচিত নয়। ভক্ত প্রহ্লাদের আদর্শকে সামনে রেখে চেষ্টা করা উচিত। যদি এতে মাতা-পিতা-ভাই প্রভৃতি কেউ বাধা দেয় তো তাঁদের সেবাদ্বারা প্রসন্ন করা উচিত। সেবা তো সর্ব জীবেরই করা উত্তম এবং কর্তব্যও বটে।

সাংসারিক ভোগে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, সাংসারিক ভোগ-বিলাস, আরাম ও সাজগোজ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, ধোঁকা দিয়ে ডুবিয়ে দেয় ও লোভ বৃদ্ধি করে গলায় ফাঁস লাগায় ; একথা জেনে ভুলেও এইসব বিষয়ের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ো না। এগুলিতে তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য সুখের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু শেষে তার বিনাশ হয়ে যায়। অতএব এইগুলিকে ভয় করে চলা উচিত। এই ধরনের বিচার-বিবেচনায় চিত্তে প্রসন্নতা ও বিষয়-আশয়ে বৈরাগ্য হতে পারে এবং পরে সাংসারিক কোনো ভোগই ভালো লাগে না।

[৪৮]

ভগবানে প্রেম করার ইচ্ছা হলে ভগবানকেই সব থেকে উত্তম বস্তু বলে জানা উচিত। সংসারে নারায়ণের সমান দয়ালু তথা সুহৃদ আর কেউ নেই। তাঁর সমান কোনো প্রেমিক পুরুষই নেই। তিনি নীচ ব্যক্তিগণকেও ভালোবাসেন। কাউকেও ঘৃণা করেন না। যদি কোনো মানুষ নিজের

নীচতার কথা ভেবে ভগবানের ভজনা না করে তাহলে তার আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু ভগবানের দিক থেকে তো সবার জন্যই দরজা খোলা রয়েছে। একজন ব্যক্তি যতই নীচ প্রকৃতির হোক না কেন যদি সে নিরন্তর ভজন করে তাহলে ভজনের প্রতাপে তারও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়ে যাবে। ভগবানের এই প্রভাবকে যদি কেউ না জানে তাতে ভগবানের কোনো দোষ নেই।

[৪৯]

তুমি লিখেছো যে 'ধ্যানে মন লাগছে না, অতএব যাতে আমার ধ্যান হয় তার জন্য চেষ্টা করুন।' —তা আমি চেষ্টা করার কে ? ভজন এবং সৎসঙ্গ বেশি হলে ধ্যান আপনা হতে হয়। আমি কী চেষ্টা করবো ? এ বিষয়ে তোমার চেষ্টাই অধিক ফলবতী হবে। যেখানে সৎসঙ্গ হয়, যত কাজই থাকুক না কেন সেই কাজ ছেড়ে সেখানে যাওয়া উচিত এবং ধ্যানের কথা শুনে সেই সময়েই সেইরূপে ধ্যান করার চেষ্টা করা উচিত। যাঁরা ধ্যান করেন এরূপ ব্যক্তিগণের নিকটে বসে ধ্যানের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ধ্যান করাকালে যে সব বিঘ্ন উপস্থিত হয় তা সেইসব ভগবৎ-ভক্তগণকে জানানো উচিত। তারপর তাঁদের নির্দেশানুসারে সাধনের চেষ্টা করা উচিত। এরূপ করলেই ধ্যান হতে পারে।

[৫০]

তোমার প্রতি যদি কেউ ঈর্ষা করে, তাকেও তোমার ভালোবাসা উচিত। যদি কেউ তোমার খারাপ করে (নিন্দা করে) তারও তোমার উপকার করা উচিত এবং শত্রুতা যারা রাখে তাদেরও ভালো করার চেষ্টা করা উচিত। স্বার্থ, মান-বড়াই ত্যাগ করে নম্রভাবে সকলের সাথে ভালোবাসা রাখা কর্তব্য। মান-বড়াই ইত্যাদির কামনাকে জয়-করা ব্যক্তিই দুর্লভ, বলা হয়—

কঞ্চন তজনা সহজ হ্যায়, সহজ তিয়াকা নেহ।
মান বড়াই ঈর্ষা, দুর্লভ তজনা এহ॥

অর্থাৎ সোনাদানা, টাকাপয়সা ত্যাগ করা সহজ কিন্তু এ দুনিয়ায় মান, বড়াই, ঈর্ষা ত্যাগ করা দুর্লভ।

যদি ক্রোধ করতেই হয় তাহলে নিজের খারাপ গুণগুলির উপর করো, অন্যের দোষের দিকে লক্ষ্য করা উচিত নয়। বাস্তবে ভজন ও সৎসঙ্গ হলে এইসব দোষ নিজ হতেই দূর হয়ে যায়। সর্বপ্রকারে নিষ্কাম হলে অর্থাৎ কামনার নাশ হলে ক্রোধ, শত্রুতা অথবা মান-অহংকারের আর জায়গা থাকে না। যতক্ষণ এগুলো থাকে ততক্ষণ তাকে নিষ্কাম ব্যক্তি বলা যায় না।

[৫১]

ধ্যান ও বৈরাগ্য সম্বন্ধিত সাধারণ কথাগুলি লেখা হচ্ছে, বিশেষ কথা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হলে জিজ্ঞাসা করে নিলেই ঠিক হবে।

যা কিছু উদ্ভাসিত (দৃশ্যমান) সেই সবই মায়ামাত্র। মায়ার অধীশ্বর ভগবানকে এই সবের বাজীগর মনে করে, বাজীগরের ডুগডুগির মতো সাংসারিক বস্তুসমূহকে নিয়ে খেলা করা উচিত। কোনো সময়ই এই কল্পিত সংসারের সত্তাকে প্রকৃত মানা উচিত নয়। এই খেলাকে যে মানুষ সত্য বলে মনে করে, সেই ঠকে যায়। ভগবান তাকে মূর্খ বলে মনে করেন এবং তিনি ভাবেন সে এখনও আমার প্রভাব জানেনি। যে ভগবানের মর্ম বুঝেছে সে কখনো মোহিত হয় না। সংসার বলে কোনো বস্তু নেই, বাস্তবে যা কিছু বর্তমান তা সচ্চিদানন্দঘনই—এইরূপ চিন্তাকেই বৈরাগ্যজনিত চিন্তা বলা হয়ে থাকে। এক নারায়ণদেব ছাড়া আর কিছুই নেই। যা কিছু চোখের সম্মুখে ভাসমান বা প্রতীয়মান সেসব আসলে কিছুই নেই। আর যা সত্যিই আছে তা প্রতীত হয় না, কারণ ভগবানের গুণাতীত স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। সগুণ স্বরূপের উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব এবং তাঁর দর্শন হলে নির্গুণের মর্ম বুঝতে আর বিলম্ব হয় না।